

ବିଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶକ

প্রণয়নেঃ-

ଆକୁଳ ହାମ୍ରୀଦ ଆଲ-ଫାଇସି

Bangali



الملك العادل المدحود والأسدا ووعيه الحالات سلطانه

— 10 —

THE COOPERATIVE OFFICE FOR CALL & FOREIGNERS GUIDANCE AT SULTANAH
Tel: 4240077 Fax: 4251005 P.O.Box: 92575 Riyadh 11563 K.S.A. E-mail: sultarah22@hotmail.com

বিদ্যুত দর্শন

البدعة تعریف و تحذیر

(باللغة البنغالية)

প্রকাশনেও-

আব্দুল হামিদ আল-ফাইসী

প্রকাশনায়ঃ-

দ্বিতীয় কাশ্মীর, আল-মাজমাআহ ১১৯৫২, সউদী আরব
পোঁ বঙ্গ- ১০২, ফোন ও ফ্যাক্স ০৬ ৪৩২৩৯৪৯

حقوق الطبع محفوظة

ح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في المجمعـة، ١٤٢٠ـهـ

فهرسـة الملك فهد الوطنية أثناء النـشر

الفـيـضـيـ، عـبـدـ الـحـمـيدـ

البدـعـةـ تـعـرـيفـ وـخـذـيرـ — الجـمـعـةـ

صـ ١٤٢ـ ٢٢٧ـ سـمـ

٩٩٦ـ ٩١٩١ـ ٦ـ ١ـ رـدـمـكـ

(الـصـ النـصـ بـالـلـغـةـ الـبـنـغـالـيـةـ)

١ـ الـبـدـعـ فـيـ الـإـسـلـامـ

٢١٢ـ ٣ـ دـيـوـيـ ٢٠ـ ٢٢٩ـ ٥ـ

رـقـمـ الـإـيـدـاعـ : ٢٠ـ ٢٢٩ـ ٥ـ

٩٩٦ـ ٩١٩١ـ ٦ـ ١ـ رـدـمـكـ :

الطبعة الأولى

ـ١٤٢٣ـ

إعداد وصف

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في المجمعـةـ

المـجـعـةـ ١١٩٥ـ ٢ـ صـ بـ ١٠ـ ٢ـ تـ /ـ ٤٣٢٣٩٤ـ ٩ـ ،ـ ٠ـ ٦ـ فـ /ـ ٤٣١١٩٩ـ ٦ـ

هذا الكتاب

اسم الكتاب: البدعة، تعريف وتحذير

المؤلف: عبد الحميد الفيضي

اللغة: البنغالية

محتويات الكتاب

- ❖ الإسلام دين كامل من هم السلف وما منهجمهم؟
- ❖ التحذير من البدع والمتبدعة وقت ظهور أول البدع
- ❖ تعریف البدعة أسباب ظهور وانتشار البدع
- ❖ أنواع البدع عاقبة المتبدعة
- ❖ الحكم على المتبدع قواعد في معرفة البدعة
- ❖ هجر أهل البدع نماذج من البدع المنتشرة
- ❖ موقف السلف من المتبدعة كيف خارب البدع وأهلها؟

আহবান

প্রিয় পাঠক!

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তিকাবলী পড়ার জন্য আপনাকে সাদর আহবান জানাই। উক্ত পুস্তিকাবলী নিয়ন্ত্রণ :-

- ১- পথের সম্বল
- ২- ফির্কাহ নাজিয়াহ
- ৩- জিভের আপদ
- ৪- ব্যাংকের সূদ হালাল কি?
- ৫- জানায়া দর্পণ
- ৬- বিদআত দর্পণ
- ৭- ফায়ায়েলে আ'মাল
- ৮- রায়ায়েলে আ'মাল
- ৯- আদর্শ বিবাহ ও দাওয়াত
- ১০- সহীহ দুআ ও ধিক্ৰ
- ১১- সন্তান প্রতিপালন

উপর্যুক্ত পুস্তিকাবলী পেতে আমাদের ঠিকানায় চিঠি লিখুন। আমরা সাধ্যমত আপনার ঠিকানায় পাঠাবার চেষ্টা করব।

আমাদের ইলমী বিষয়ে - পুস্তিকা অথবা ক্যাসেটে - কোন প্রকার ক্রটি পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন বিষয়-বস্তু অসম্পূর্ণ থাকলে অথবা তাতে আপনার কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দাওয়াত পেশ করার কোন মুবারক প্রণালী-পদ্ধতি বা সুকৌশল থাকলে আমাদের নিকট সত্ত্বে লিখুন এবং সাগ্রহে আমাদের সাথে সওয়াবে শরীক হন। আর জেনে রাখুন, মঙ্গলের সন্ধানদাতা মঙ্গলকর্তার মতই।

আহবায়ক :-

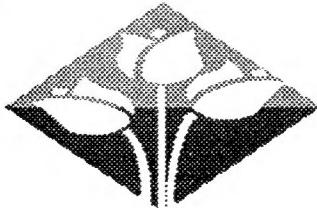
আপনার ভাত্মভলী

দাওয়াত অফিস, আল-মাজমাআহ

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

বিষয়	
গোড়ার কথা	১
ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ ধৈন	৫
বিদআত ও বিদআতীর নিষ্পত্তিবাদ	১১
বিদআতের সংজ্ঞার্থ	১৭
বিদআতের প্রকার	২০
বিদআতী প্রসঙ্গে মন্তব্য	২৫
বিদআতীর সংসর্গ	২৯
বিদআতীর প্রতি সলফের ভূমিকা	৩১
আহলে সুন্নাহ ও সালাফী কি?	৩৭
সালাফী নীতিমালা	৩৮
বিদআতের প্রথম বিকাশ	৪২
বিদআত সৃষ্টির কারণ	৪২
১ম কারণঃ অজ্ঞতা	৪৩
২য় কারণঃ প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীর অনুসরণ	৪৫
৩য় কারণঃ সন্দিহান উক্তির উপর নিভরতা	৪৭
৪র্থ কারণঃ কেবলমাত্র জানের উপর ভরসা করা	৪৮
৫ম কারণঃ ইমাম ও বুর্যুদ্দের অঙ্গানুকরণ ও পক্ষপাতিত	৫১
৬ষ্ঠ কারণঃ বিদআতীর সংসর্গ	৫৩
৭ম কারণঃ উলামাদের নীরবতা ও স্বার্থাব্বেষিতা	৫৩
৮ম কারণঃ বিজ্ঞাতির অনুকরণ	৫৫
৯ম কারণঃ কাশ্ফ ও স্পন্দ	৫৭
১০ম কারণঃ যায়ীক ও জাল হাদীসের উপর ভিত্তিকরণ	৫৭
বিদআত ও বিদআতীর পরিণাম	৬৬
বিদআতের নীতিমালা	৮০
প্রচলিত কিছু বিদআতের নমুনা	৮১
পরিশেখেঃ বিদআত কিভাবে কৰব?	৯৪



গোড়ার কথা

ইসলাম চিরন্তন ও কালজয়ী দ্বীন। এই পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের আসল কৃপ অবিকৃত ও অক্ষত রাখতে হলে তার প্রতি ভেজালের সকল অনুপ্রবেশ দ্বার বক্ষ করতে হবে। যেহেতু দ্বীন পরিপূর্ণ এক প্লাস দুর্ক্ষের ন্যায়, যাতে এক বিশ্বাস অন্য কিছু বাধার, সংযোজন ও পরিবর্থন করার কোন অবকাশ নেই। “ওর্ণ-এর্ণ” কথা ও অভিযন্তের পানি বা গোমুককে তাতে স্থান দিতে গেলে অবশ্যই বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল কিছু দুখ প্লাস হতে উপচে পড়ে যাবে এবং ধীরে ধীরে এন্টুর্ফ পানের অযোগ্য হয়ে পড়বে। তাই দ্বীনে যাতে ভেজাল প্রবেশ না করে তার জন্য আল্লাহর রসূল-সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লাম-উয়াতকে অতি গুরুত্বের সহিত তাকিন্দ করে গেছেন। তাঁর সাহাবা, তাবেয়ীন এবং সলফগণও ঐ ভেজাল মিশ্রণ থেকে মুসলিমদেরকে উচিত সতর্ক করে গেছেন। তাঁদের পর সেই ফরয়ই ওলামাগণের উপর বর্তায়। ভেজালের প্রত্যেক ছিদ্র পথ বক্ষ করা, অনুপ্রবিষ্ট ভেজাল চিহ্নিত করে তা উৎখাত করা এবং ঐ নির্ভেজাল দুর্ক্ষকে কালোবাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা হতে চোরা ব্যবসায়ীদেরকে প্রতিহত করা তাঁদের এবং সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মহান কর্তব্য।

এই কর্তব্যভার অনুভব করে, সমাজের মানুষকে সাবধান করার লক্ষ্যে অধিমের সাধ্যমত এই কিঞ্চিং প্রয়াস। এর দ্বারা সমাজে কিছু পরিমাণও জাগরণ এলে এবং সঠিক পথ সুষ্পষ্ট হলে শ্রম সার্থক হবে। এতে যা কিছু প্রমাণ করতে চেয়েছি তা সঠিক হলে আল্লাহর তরফ হতে এবং ভুল হলে আমার ও শয়তানের তরফ হতে। প্রমাণ সহ ত্রুটি চিহ্নিত করে জ্ঞানীরা আমার সঠিক দিগন্দর্শন করলে কৃতজ্ঞ হব।

এই পৃষ্ঠিকাটি প্রস্তুত করতে বহু মূল্যবান গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছে। তার মধ্যে আল-ইতিসাম (শাতেবী), সহীহল জামিইস সঙ্গীর (বৃহদেস আলবানী), আল-ইবদা^১ ফী মায়া-রিল ইবতিদি^২ (আলী মাহফুয়), আল-বিদআতু, যাওয়াবিতুহা অ আসারহাস সাইয়ে ফিল উম্মাহ (ডঃ আলী মুহাম্মাদ নাসের আল-ফাকীহী) এবং তামবীহ উলিল আবসার ইলা কামালদীন অমাফিল বিদায়ি মিনালআখতার (ডঃ সালেহ সাদ আল-সুহাইবী) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তাঁ^৩দের সকলকে এবং আমাদেরকে নেক প্রতিদান দিন।

সারা বিশ্বে কুরআন ও সুন্নাহর নির্ভেজাল প্রচারে সউদিয়ার যুব-সমাজের নিঃসুর্থ আগ্রহ ও প্রচেষ্টার সীমা নেই। এর পশ্চাতে তাঁরা কেবল আল্লাহর নিকট বৃহৎ প্রতিদানই চান।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নগণ্যের পৃষ্ঠিকাটিকে মাজমাআর দাওয়াত অফিস কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করে সমাজকে উপহার দিতে আনন্দবোধ করেছেন। তাই তাঁদের জন্য আমাদের আন্তরিক নেক দু'আ। আল্লাহ তাঁদেরকে উন্নত প্রতিদান দিন ও অধিক ভাল কাজে আরো আরো তওঁফীক দিন এবং মুসলিম সমাজকে বিদআত ও শিরকের সর্বনাশ থেকে বাঁচিয়ে কিতাব ও সুন্নাহর অনাবিল “আবে হায়াতে” পরিপূর্ণ করুন। আমীন।

আব্দুল হামিদ ফায়েজ
আল-মাজমাআহ
২২/৯/১৪১৫হিঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنَعْمَتِهِ تَمَّ الصَّالَاتُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَبَعْدُ:

জানা আবশ্যক যে, দ্বিনে অনুপ্রবিষ্ট অভিনব কর্ম (বিদআত) সমূহ সম্পর্কে অবস্থিত হওয়া এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু এই বিদআত থেকে মুক্ত না হয়ে মুসলিমের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব হয় না। এই মুক্তি লাভও ততক্ষণ সম্ভবপর নয় যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিদআত সমূক্ষে পরিচিতি লাভ না হয়েছে- যদি তার নিয়মাবলী ও মৌলিক সূত্র না জানা থাকে তা হলে। নচেৎ অজান্তে বিদআতে আপত্তি হওয়াই সুভাবিক। অতএব বিদআত সম্পর্কে জ্ঞান রাখা ওয়াজেব। কারণ যে জিনিষ ছাড়া কোন ওয়াজেব পালন হয় না সে জিনিষও ওয়াজেব, যেমন ওসলের ওলামাগণ বলেন।

তদনুরূপই শির্ক ও তার বিভিন্ন প্রকারাদিকে জানা। কারণ যে শির্ক না চিনবে সে তাতে নিপত্তি হবে। যেমন বহু সংখ্যক মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা। দেখা যায় তারা শির্ক দ্বারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে চায়। যেমন আউলিয়া ও সালেহীনদের নামে নয়র মানা, শপথ করা, তাঁদের কবর তওয়াফ করা, তার উপর মসজিদ নির্মাণ করা এবং সেখানে সিজদা করা প্রভৃতি কর্ম যার শির্ক হওয়ার কথা আহলে ইলমদের নিকট অবিদিত নয়। এই জন্যই ইবাদত করায় কেবল সুন্নাহ জানার উপর সংক্ষেপ করা যথেষ্ট নয়, বরং তার সাথে তার পরিপন্থী বিদআতকে চেনাও জরুরী। যেমন-ইমানের জন্য কেবল তওহাদ জানাই যথেষ্ট নয় বরং তার সাথে তার পরিপন্থী শির্ককে চেনাও একান্ত দরকার। এই তথ্যের প্রতিই কুরআন মজাদে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন :

**وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا
اللَّهَ وَاجْتَنَبُوا الْطَّغْوَتَ**

অর্থাৎ, “এবং অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল প্রেরণ করেছি (এই নির্দেশ দিয়ে) যে, তোমরা আমারই এবাদত কর এবং তাগুত (পূজ্যমান গায়রূল্লাহ) থেকে দূরে থাক।।” (সূরা নাহল ৩৬)

তিনি আরো বলেন :

وَالَّذِينَ أَجْتَبَيْوَا الظُّفُورَ أَنْ يَغْبَرُوهَا وَأَنْابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمْ أَنْشُرَىٰ

অর্থাৎ, “যারা তাগুতের ইবাদত করা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী হয় তাদের জন্য আ হে সুসংবাদ।” (সূরা যুমার ১৭)

তিনি আরো বলেন :

فَمَنْ يَكْفِرْ بِالْأَطْنَابِ

وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقِدْ أَنْتَمْسَكَ بِالْعَرْوَةِ الْوُتْقِيِّ لَا يَبْصِمُ لَهَا

অর্থাৎ: “সুতরাং যে তাগুতকে অসীকার করবে ও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, নিশ্চয় সে এমন এক শক্ত হাতল ধারণ করবে যা কখনো ভাঙ্গার নয়।”

(সূরা বাকারাহ - ২৫৬)

আর এ তথ্যই আল্লাহর রসূল-সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্পষ্ট করে তুলে ধরে বলেন, “যে ব্যক্তি ‘না ইলাহা ইল্লাল্লাহ’(আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই) বলল (সীকার করল) এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য পৃজিত বাতিল মা’বুদ সমূহকে অসীকার করল, তার মাল ও জান হারাম হয়ে গেল। (অর্থাৎ সে মুসলিম বলে গণ্য হয়ে গেল) এবং তার (বাকী) হিসাব আল্লাহর উপর।” (মুসলিম)

সুতরাং তিনি কেবল আল্লাহর তওহীদ সীকার করাকেই যথেষ্ট মনে করেননি বরং তার সহিত আল্লাহ ছাড়া অন্য সব পৃজ্যমান ব্যক্তি-বস্তুকে অসীকার ও বর্জন করাকে একই স্তুতে শামিল করেছেন। অতএব এ তথ্যও এই নির্দেশই স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করে যে, ঈমান আনার সাথে সাথে কুফরীকে চেনা জরুরী, নতুবা অজান্তে কখন মুমিন কুফরীতে আপত্তি হয়ে যাবে তার কোন টেরই পাবে না ।

অনুরূপ ভাবে সুন্নাহ ও বিদআতের ক্ষেত্রেও একই নির্দেশ। এ উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ ইসলাম দুই বৃহৎ বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না এবং দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ যা বিধিবদ্ধ করেছেন সে শরীয়ত ছাড়া আর ভিন্ন কোন নিয়ম-পদ্ধতিতে বা নির্দেশে তাঁর ইবাদত করব না। অতএব যে ব্যক্তি এই দুই বুনিয়াদের মধ্যে কোন একটিকে উপেক্ষা করে সে অপরটিকেও বর্জন করে এবং সে আল্লাহ তাআলার ইবাদতই করে না। যেহেতু প্রথম ভিত্তি ত্যাগ করলে মুশরিক এবং দ্বিতীয়টি ত্যাগ করলে বিদআতী হয়ে যাবে।

অতএব পূর্বোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হল যে, বিদআত চেনা অবশ্যই জরুরী। যাতে মুমিনের ইবাদত তা থেকে মুক্ত ও নির্মল হয়ে আল্লাহর নিকট গ্রহণ-যোগ্য হয়।

পক্ষান্তরে বিদআত সেই অনিষ্টকর বস্তু সমূহের অন্যতম যাকে চেনা ও জানা ওয়াজেব-তা গ্রহণ করার জন্য নয়, বরং তা থেকে বাঁচার জন্য। যেমন আরবী কবি বলেন :

“মন্দ জেনেছি বাঁচার লাগি নহে মন্দের তরে,
ভালো কি মন্দ চিনে না যে সে মন্দেতে গিয়ে পড়ে।”

অবশ্য এর মর্মার্থ হাদীস শরীফ হতে গৃহীত। সাহাবী হয়াইফা ইবনুল ইয়ামান রাখিয়াল্লাহ আনহ বলেন, ‘লোকেরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ইষ্টকর ও মঙ্গল বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত আর আমি কবলিত হবার আশংকায় তাঁকে অনিষ্টকর ও অমঙ্গল বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতাম।’ (বুখারী ও মুসলিম) এবং এ জন্যই যে সমস্ত বিদআত দ্বারে অনুপ্রবেশ করেছে তার উপর মুসলিম জাতিকে সতর্ক ও অবহিত করা নিতান্ত জরুরী এবং বিষয়টি এত গুরুত্বহীন নয় যে, কেবল তাদেরকে তওহীদ ও সুন্নাহ সম্পর্কিত জ্ঞান ও নির্দেশ প্রদান করাই যথেষ্ট - আর শির্ক ও বিদআত প্রসঙ্গে কোন কথা উৎপাদনের প্রয়োজন নেই বরং এ বিষয়ে চুপ থাকাই ভালো ! - যেমন অনেকে এ ধরনের ধ্যান-ধারণা রেখে থাকে। অথচ এটা এক সংকীর্ণ দৃষ্টি ভঙ্গির ফল। যা শির্কের পরিপন্থী তওহীদ এবং বিদআতের পরিপন্থী সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞান - সন্তুতার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং একই সময়ে এই দৃষ্টি-ভঙ্গি ঐ ধরণের মানুষদের অঙ্গতার ইঙ্গিত বহন করে। কারণ তারা জানে না যে, বিদআতে যে কেউ আপত্তিত হতে পারে, এমনকি আলেম মানুষও। কেননা বিদআত করা বা তাতে আপত্তি হওয়ার বহু কারণ আছে। যার মধ্যে যয়ীফ ও মওজু (জাল) হাদীসের উপর ভিত্তি করে আমল করাও অন্যতম। যেহেতু কখনো কিছু ওলামার নিকটেও তার কিছু অপুকাশ থেকে যেতে পারে। যাকে তাঁরা সহীহ হাদীস মনে করে তার উপর আমল করে থাকেন এবং আল্লাহর সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি লাভের আশা করেন। অতঃপর তাঁদের ছাত্ররা ঐ বিষয়ে তাঁদের অনুকরণ করে এবং ধীরে ধীরে জনসাধারণও তাঁদের দেখে নিঃসন্দেহে আমল করতে লাগে। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই তা পালনীয় সুন্নাহর আকার ধারণ করে। (আল- আজবিবাতুন নাফেয়াহ ফিল জুমআহ, আলবানী ৬১ - ৬৩ পৃঃ)

তাই তো পরে কোন আলেম সে বিষয়ে অবহিত হয়ে তা রদ্দ করতে গেলে বা তার পরিবর্তে সহীহ সুন্নাহর প্রতি পথ-নির্দেশ করতে গেলে ওদের অনেকে বলে, নতুন হাদীস ! ও'রা কি জানেন না বা জানতেন না ? ” -- ইত্যাদি ।

ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ দ্বীন

আল্লাহ বলেন,

“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মরো না।” (সূরা আলে-ইমরান ১০২)

“হে মানব ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার সঙ্গনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু জন থেকে বহু নরনারী বিস্তার করেছেন এবং আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্জা-কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন ।” (সূরা নিসা ১)

“হে মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল; তাহলে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে ঝটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন । যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে ”। (সূরা আহযাব ৭০ - ৭১)

আল্লাহ জাল্লা শানুহ তাঁর বাস্তাদেরকে ঐক্যবন্ধ হতে আদেশ করেছেন এবং অনৈক্য ও আপোস-বিরোধিতা করতে নিষেধ করেছেন । তিনি বলেন :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّقُوا وَإِذْ كُرِّؤْا يُعْمَلَتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ
كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَالْفَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ يُنْعَمِتَهُ إِخْرَاجًا وَكُنْتُمْ عَلَى
شَفَاعَ حُفْرَةٍ مِّنَ الْتَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ عَائِبَتِهِ لَعْلَكُمْ

تَهْتَدُونَ

অর্থাৎ “এবং তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (দ্বীন ও কুরআন)কে শক্ত করে ধর এবং পরম্পর বিছিন্ন হয়ো না । তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, তোমরা পরম্পর শক্ত ছিলে, তিনি তোমাদের হাদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন । ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরম্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে । তোমরা অগ্নিকুণ্ডের (জাহানামের) প্রাণে ছিলে, অতঃপর তিনি তা থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন । এরপে আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার ।” (সূরা আলে ইমরান ১০৩)

এই এক্য রক্ষার জন্য, আল্লাহর রঞ্জুকে সুদৃঢ় ভাবে ধারণ করার জন্য এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে রেহাই পাবার জন্য তিনি বাস্দাদেরকে রসূলের উপর নামেল-কৃত অনুশাসনের অনুসরণ করতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেন :

الْمَقْصُدُ كِتَابٌ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكُمْ
حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُشْنِدَرَ بِهِ وَذُكْرُنِي لِلْمُؤْمِنِينَ ⑦ أَتَيْغُوا مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ
مِّنْ رِبَّكُمْ وَلَا تَشْيِعُوا مِنْ دُونِهِ أُولَيَاءُ قَلْبًا مَا تَنَزَّلَ كُرُونَ ⑧

অর্থাৎ “এই কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতএব তোমার মনে যেন এর সম্পর্কে কোন দ্বিধা না থাকে। যাতে এর দ্বারা তুমি (মানুষকে) সতর্ক কর এবং এটা মুমিনদের জন্য উপদেশ। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছেড়ে অন্যান্য অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।”
(সূরা আরাফ ২-৩)

যেমন তিনি বাপদাদা (অনুরূপ বুয়ুর্গ, বাড়লিয়া ও বিদআতীদের)সে সব বিষয়ে অনুকরণ করতে নিষেধ করেন যে সব বিষয় কিতাব ও সুন্মাহর অনুশাসনের বিপরীত। তিনি বলেন :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَيْغُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَاتِلُوا بَلْ نَسْبِعُ مَا أَفْتَنَاهُمْ
أَبَآءَهُنَا أَوْ لَوْ كَانَ ءَابَآءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا
يَهْتَدُونَ

অর্থাৎ “আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, ‘আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার তোমরা অনুসরণ কর; তখন তারা বলে, ‘(না-না) বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে (যে মতামত ও ধর্মাদর্শে) পেয়েছি তারই অনুসরণ করব।’ যদিও তাদের পিতৃ-পুরুষগণ কিছুই বুবত না এবং তারা সৎপথেও ছিল না।”
(সূরা বাকারাহ ১৭০)

তিনি বলেনঃ
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَيْغُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَاتِلُوا بَلْ نَسْبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
أَبَآءَهُنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَنُ يَذْعُو هُمْ إِلَى عَذَابِ الْتَّعْبِيرِ ⑨

অর্থাৎ “আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা সে বস্তুর অনুসরণ কর; যখন তারা বলে আমাদের বাপদাদাকে যাতে পেয়েছি আমরা তো তাই মেনে চলব যদিও শয়তান তাদেরকে নরক যন্ত্রণার দিকে আহ্বান করে (তথাপি কি তারা বাপ-দাদারই অনুসরণ করবে)?”(সূরা লুকমান-২৯)

সুতরাং কিতাব ও সুন্নাহর মতামত ছাড়া অন্য কোন মতবাদের দিকে আহ্বান কারী প্রবৃত্তি, নরকের দিকে আহ্বানকারী মানুষ অথবা শয়তানের অনুকরণ করতে মুসলিমকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন কিতাব ও সুন্নাহরই অনুসরণ করতে, কেবল এ দুটিকেই জীবন-সংবিধান রূপে গ্রহণ ও ধারণ করতে সে আদিষ্ট হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মানুষের পরিভ্রান্ত ও সফলতা কেবল এ দু’য়ের অনুসরণেই আছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, ‘তোমাদের মাঝে এমন দুটি জিনিষ ছেড়ে যাচ্ছি তা যদি তোমরা শক্ত ভাবে ধারণ কর তবে কোন দিন পথভুষ্ট হবে না ; আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ ।’ (মুয়াত্তা মালেক ইত্যাদি)

এই বাণীতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কিতাব ও সুন্নাহর অনুসারীর জন্য সুপথ প্রাপ্তি এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বনাশী পথভুষ্টতা হতে রক্ষার জামানত নিয়েছেন। যেমন অন্যদিকে আল্লাহর দ্বিনে বিদআত রচনা করতে কঠোর ভাবে নিষেধ ও সর্তর্ক করেছেন এবং সারা উশ্মতকে স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছেন যে, আল্লাহর দ্বিনে যে কোন বিদআত পথভুষ্টতার কারণ। সাহাবী ইরবায় বিন সারিয়াহ রায়িয়াল্লাহ আনহ বলেন, (একদা) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদেরকে এমন উচ্চাসের উপদেশ দান করলেন যাতে আমাদের চিন্ত কমিপ্ত এবং চক্ষু অশ্রুতে বহমান হল। আমরা বল্লাম, হে আল্লাহর রাসূল ! এটা যেন বিদায়ী উপদেশ, অতএব আমাদেরকে কিছু অসিয়ত (অতিরিক্ত নির্দেশ দান) করুন। তিনি বলেন, “তোমাদেরকে আল্লাহর ভীতি এবং (পাপ ছাড়া অন্য বিষয়ে) আমীর (বা নেতা) এর আনুগত্য সৌকার করার অসীমত করছি, যদিও বা তোমাদের আমীর এক জন ক্রীত দাস হয়। এবং অবশ্যই তোমাদের মধ্যে যারা আমার বিদায়ের পর জীবিত থাকবে তারা অনেক রকমের মতভেদ দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার এবং আমার সুপথ প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করো, তা দ্বারা দৃঢ়তার সহিত ধারণ করো। (তাতে যা পাও মান্য কর এবং অন্য কোনও মতের দিকে আকৃষ্ট হয়ো না।) এবং (দ্বিনে) নবরচিত কর্ম সমূহ হতে সাবধান ! কারণ নিশ্চয়ই প্রত্যেক বিদআহ (নতুন আমল) ভষ্টতা।” (আবুউদ্দেন ৪৪৪৩ তিরমিয়ী ২৮১৫, ইবনে মাজাহ ৪২)।

উল্লেখিত হাদীস শরীফটি উস্মাহর মাঝে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে, ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী মতভেদ ও অনৈক্য নির্মূল করতে উদ্বৃদ্ধ করে, সুন্নাহর

অনুসরণ করে, জামাআত (সাহাৰা) এৰ অনুগমন কৰে, দাওয়াত পদ্ধতি, কৰ্ম, কথা ও বিশ্বাসে প্ৰত্যেক নব রচিত কৰ্মসমূহ বা বিদআত হতে সুন্দৱে থাকতে আদেশ কৰে ; যা বিভাট ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকাৰী বিতৰ্ক ও কলহেৱ প্ৰতি উশ্মাহকে টেনে নিয়ে যায় ।

আল্লাহ তাআলার প্ৰত্যাদেশ ও শৱীয়ত উশ্মাহৰ কাছে পৌছে না দেয়া ও যথাযথ ভাবে তা বিবৃত না কৱাৱ পূৰ্বে তাৰ প্ৰিয় রসূল ইহকাল ত্যাগ কৱেন নি। তিনি উশ্মাহকে সে সকল কিছু কৰ্তব্যাকৰ্তব্য বৰ্ণনা কৱে গেছেন যাতে তাদেৱ পাৰ্থিব ও দ্বীনী কল্যাণ ও ইষ্ট নিহিত ছিল। তিনি উশ্মাহকে এমন সমুজ্জুল পথে রেখে গেছেন যাৱ রজনীও দিবসেৱ ন্যায় দীপ্তিমান; যে পথ হতে একমাত্ৰ ধৰ্সনগামী ব্যতীত অন্য কেউ বক্ৰতা অবলম্বন কৱে না ।

আৱ আল্লাহ জাল্লাহশানুহ তাৰ প্ৰিয় নবীৱ জন্য দ্বীনকে পৱিষ্ঠ পূৰ্ণ ও তাৰ সম্পদকে সম্পূৰ্ণ কৱেছেন। আৱ সমগ্ৰ মানব ও দানব জাতিৱ জন্য ইসলামকেই একমাত্ৰ ধৰ্ম বলে মনোনীত ও নিবাচিত কৱেছেন। তিনি বলেন :

الْمُؤْمِنُ أَكْتَبَ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ عَلَيْكُمْ بِعْدَيْتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ وَبِئْتِ^{۱۴}

অর্থাৎ “আজ তোমাদেৱ জন্য তোমাদেৱ দ্বীন পূৰ্ণাঙ্গ কৱলাম ও তোমাদেৱ প্ৰতি আমাৱ অনুগ্ৰহ (নেয়ামত) সম্পূৰ্ণ কৱলাম এবং ইসলামকে তোমাদেৱ ধৰ্ম মনোনীত কৱলাম” (সূৱা মায়েদাহ ৩)

অন্যত্বে বলেন :

وَمَنْ يَتَشَيَّعْ غَيْرُ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
الْخَسِيرِينَ (১৫)

অর্থাৎ “এবং কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধৰ্ম চাইলে তা কখনো তাৱ নিকট হতে গ্ৰহণ কৱা হবে না এবং সে পৱকালে ক্ষতিগ্ৰস্তদেৱ দলভুক্ত হবে” (সূৱা আলে ইমরান ৮৫)

সুতৰাং এখন হতে প্ৰতীয়মান হয় যে, দ্বীন অসম্পূৰ্ণ নয়, বৱং সম্পূৰ্ণ। এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তা স্পষ্টভাৱে প্ৰচাৱণ কৱে গেছেন। যেমন হ্যবত আয়েশা ৱায়িআল্লাহু আনহা বলেন, যে ব্যক্তি ধাৱণা কৱে যে, মুহাম্মদ

সাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহর অবতীর্ণ প্রত্যাদেশের কিছুও গুণ্ঠ করেছেন তবে সে নিশ্চয় আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোগ করে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন :

• ﴿يَتَأْكِلُهَا أَلْرُوشُونْ بِلِقَعْ مَا أَنْدِرَ إِلَيْكَ مِنْ رِّيَّكَ قَيْنَ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلْكَتْ
• بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অর্থাৎ “হে রাসূল ! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর, যদি না কর তবে তুমি তাঁর বর্তা প্রচার করলে না।” (সূরা মায়দাহ ৬৭)

অনুরূপভাবে বিদায়ী হজ্জের ভাষণে রসূল সাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বিভিন্ন অনুদেশ, বৈধাবিধ এবং পরম্পরার মান-ইজ্জত হারাম হওয়ার প্রসঙ্গ বিবৃত করার পর বলেছিলেন : “শোন ! আমি কি (আল্লাহর প্রত্যাদেশ তোমাদের নিকট যথাযথভাবে) পৌঁছে দিলাম ?” সাহাবা-বৃন্দ বলেছিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই।’ তখন তিনি আকাশের প্রতি হস্তোভলন করে বলেছিলেন, “হে আল্লাহ ! সাক্ষী থাকুন, আল্লাহ ! সাক্ষী থাকুন।”

অতএব এর পরেও যদি কোন ব্যক্তি দীনে নতুন কিছু আবিষ্কার করে যার নির্দেশ না কিতাবে আছে না সুন্নাতে এবং না -খুলাফয়ে রাশেদীন বা কোনও সাহাবার আর্দশে, তা আকীদা হোক বা আমল, কথা হোক বা ইসলামের প্রতি দাওয়াতী পদ্ধতি তবে ঐ ব্যক্তি যেন বলে যে, ‘দীন অসম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ নয়।’ এবং সে এই অসম্পূর্ণতাকে নতুন কিছু (বিদআত)রচনার মাধ্যমে পূর্ণতা দান করার দুঃসাহসিকতা করে থাকে। অথচ আল্লাহ বলেন “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।”

অথবা ঐ ব্যক্তি যেন এই বলে বা ধারণা করে যে, ‘দীনতো পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু এমন কিছু বিষয় আছে যা নবী প্রচার করে যাননি !’ অথচ হ্যারত আয়েশার হাদীস তা ভীষণ ভাবে খণ্ডন করে। অনুরূপভাবে বিদায়ী হজ্জের ভাষণে তাঁর তাবলীগ ও প্রচার প্রসঙ্গে গুরুত্ব আরোপ করে এ বিষয়ে আল্লাহকে সাক্ষী রাখেন। এবং সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, “তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে পৌঁছে দেবে। সম্ভবতঃ যার নিকট (ইলম) পৌঁছে দেওয়া হবে সে শ্রোতা অপেক্ষা অধিক শৃতিমান হতে পারে।”

অতএব বিদআতীর রসনা অথবা অবস্থা যেন বলে যে, ‘শরীয়ত পূর্ণাঙ্গ নয়। এমন কিছু বিষয় আছে যা তাতে সংযোজন ও পরিবর্ধন করা ওয়াজেব অথবা মুস্তাহাবা’ যেহেতু তার বিশ্বাস যদি এই থাকতো যে, শরীয়ত সর্বতোভাবে

পূর্ণতাপ্রাপ্ত, তবে নিশ্চয় তাতে আধুনিক কিছু উন্নাবন করে তাকে ‘শরীয়ত’ নাম দেবার অপচেষ্টা ও দৃঃসাহসিকতা আদৌ করত না। আর এ রূপ আকীদা ও বিশ্বাসের মানুষ অবশ্যই পথভৃষ্ট, সত্য ও সঠিক পথ হতে বহু দূরে !

ইবনে মাজেশুন বলেন : আমি ইমাম মালেক (রঃ) কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন বিদআত রচনা করে এবং তা পুণ্যের কাজ মনে করে সে ব্যক্তি ধারণা করে যে হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম রেসালাতের খিয়ানত (আল্লাহর প্রত্যাদেশ প্রচারে বিশ্বাসঘাতকতা) করেছেন। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।” অতএব সেদিন যা দ্বীন ছিল না আজও (নতুন ভাবে) তা দ্বীন নয়। (আল-ইতিসাম ১/৪৯)

ইমাম শাতবী তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ আল-ইতেসামে বলেন :

১ - বিদআতী শরীয়তের বিরোধী ও দ্বীনের পরিপন্থী । কারণ আল্লাহ আয়া অজান্না বান্দাদের জন্য তাঁর ইবাদতের নির্দিষ্ট পথ ও পদ্ধতি নির্ধারিত করেছেন এবং তারই উপরে সৃষ্টিকে তাঁরই আদেশ ও নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে তিরক্ষারের ও পুরুষারের অঙ্গীকারের সহিত সীমাবদ্ধ করেছেন, আর এও জানিয়েছেন যে, কেবল মাত্র তাতেই মঙ্গল নিহিত আছে এবং এর সীমালঙ্ঘনে অমঙ্গল ও বিপদ আছে। যেহেতু আল্লাহ (কিসে ভাল অথবা মন্দ তা) জানেন ও আমরা কিছুও জানি না। আর বিদিত যে, তিনি তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কে জগন্মসীর করণা সূরপ প্রেরিত করেছিলেন ।

কিন্তু বিদআতি এসব কিছুকে অমান্য ও অসীকার করে। সে মনে করে যে, (আল্লাহর নির্ধারিত ও সীমিত পথ ব্যতীত) আরো অন্যান্য পথও আছে (যাতে তাঁর সামিপ্য ও সন্তুষ্টি লাভ হয়) তিনি যা নির্দিষ্ট করেছেন তাতেই সীমাবদ্ধ নয় ! এবং যা নির্ধারিত করেছেন স্টাই চূড়ান্ত ও শেষ পথ নয় ! যেন সে বলে ‘আল্লাহ জানেন, আমরাও জানি, বরং আল্লাহর শরীয়তে সংযোজন ও পরিবর্ধন করে সে ভাবে যে, আল্লাহ যা জানতেন না তা সে জেনে ফেলেছে (নাউয়ু বিল্লাহি মিন যালিক)।

বিদআতীর এমন কর্ম ও ধারণা যদি সুস্থাকৃত হয় তবে নিশ্চয় তা কুফর এবং যদি তা অনিস্থাকৃত হয় তবে তা ঝুঁটতা ।

২- বিদআতী তার এই কাজে নিজেকে আল্লাহ তাআলার প্রতিদৰ্শী মনে করে। কারণ আল্লাহ পাক শরীয়ত রচনা করেছেন এবং মানুষকে তাঁর সেই বিধান অনুযায়ী বাধ্য বাধ্য-বাধকতার সাথে চলতে আদেশ করেছেন। এবং তিনিই এ কাজে একক ও

অদ্বিতীয়। কারণ বাস্তবে যাতে মতভেদ করে থাকে সে বিষয়ে মীমাংসা তিনিই দান করে থাকেন।

তাই শরীয়ত কোন জ্ঞানলক্ষ বস্তু নয় বা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা রচিত বিধান নয়; যা যে কেউ ইচ্ছা করলে নিজের তরফ হতে রচনা বা সংযোজন করতে পারে। যদি ব্যাপারটা তাই হত তাহলে আর জগদ্বাসীর জন্য কোন নবী বা রাসূল প্রেরণ করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বিদআতী বিদআত রচনা করে যেন সে নিজেকে শরীয়ত রচয়িতার প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষ মনে করে। তাই সে তার মত শরীয়ত-বিধান উদ্ভাবন করতে সাহস পায়। এবং এর দ্বারা মতান্তর ও বিচ্ছিন্নতার দ্বার উদ্ঘাটন করতে প্রয়াসী হয়।

৩- আবার বিদআতী তার এই কাজে নিজের কামনা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে। অথচ আল্লাহ পাক বলেন :

وَمِنْ أَصْلِ مَنْ اتَّبَعَ هُوَاهُ بَغْيَرِ هُدًىٰ مِنَ اللَّهِ ۝ سُورَةُ الْقَصْصَ

অর্থাৎ “আল্লাহর পথ-নির্দেশ ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে ? (সূরা কাসাস ৫০) অতএব যে ব্যক্তি তার আত্মার প্রবৃত্তিকে আল্লাহর পথ-নির্দেশের অনুসারী করে না তার চেয়ে বেশী পথভৃষ্ট আর কেউ নেই।

বিদআত ও বিদআতীর নিন্দাবাদ

আল্লাহর দ্বিনে নব বিধান রচনাকারী বিদআতী-যে নিজেকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে কুরআন কারীমে তার নিন্দা করা হয়েছে। কারণ বিদআতের পথ বক্রপথ। আর যে বক্র পথে চলতে চায় আল্লাহ তার হৃদয়কে বক্র করে দেন। যেহেতু প্রতিশেধ কৃতকর্মের সম্ম হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

অর্থাৎ “অতঃপর ওরা যখন বক্রপথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহই তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ সত্যত্যাগী (ফাসেক) সম্পদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।” (সূরা সাফাফ ৫)

তাদের এ শাস্তি এই জন্যই যে, তারা কুরআনের ক্রপক আয়াতের অনুসরণ করে, সুস্পষ্ট দ্ব্যুর্থীন আয়াত বর্জন করে এবং ক্রপক আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা ও

তাৎপর্য অনুসন্ধান করে বরং আয়াতের অর্থ বিকৃত করে থাকে। আল্লাহ জাল্লা
তাআলা বলেন :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَاتٌ مُّحَكَّمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ
وَأُخْرَى مُتَشَبِّهَاتٌ فَإِمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَيْغٌ فَيَتَبَعُونَ مَا تَشَبَّهَ مِنْهُ
أَبْيَعَةً الْفِتْنَةَ وَأَبْيَعَةً تَأْوِيلَهُ

অর্থাৎ “তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কিছু
আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যুর্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ, আর অন্য গুলি রূপক ;
যাদের মনে বক্রতা আছে তারা ফিতনা (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা
রূপক তার অনুসরণ করে,” (সূরা আলে ইমরান ৭)

হ্যরত আয়েশা কর্তৃক হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি অসাল্লাম এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, “যাদেরকে
রূপক আয়াতের অনুসরণ করতে দেখবে আল্লাহ তাদেরকেই উদ্দেশ্য করেছেন।
অতএব তোমরা ঐ ধরনের মানুষ হতে সাবধান থাকো।”

অন্য এক বর্ণনায় বলেন,“যাদেরকে রূপক আয়াত নিয়ে তর্ক-বিবাদ
(অনুরূপতাবে রহস্য ও ভেদ বের করার অপচেষ্টা) করতে দেখবে তাদেরকেই আল্লাহ
লক্ষ্য করে বলেছেন। অতএব তাদের থেকে সাবধান থেকো।”

আল্লাহ বলেন :

الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شَيْئاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَرِيعَةٍ

অর্থাৎ “অবশ্যই যারা ধর্ম সমূক্ষে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে কোন কিছুতেই তুমি তাদের মধ্যে নও।” (সূরা আনআম ১৫৯) (এবং তারা তোমার দলভুক্ত নয়।)

ইবনে কাসীর বলেন, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে ; যেমন বিভিন্ন সম্পদায়, দল, প্রবৃত্তি ও অষ্টার অনুগামীরা হয়েছে। আল্লাহ জাল্লাশানুহ তাঁর রসূলকে সে সব দল হতে সম্পর্কহীন বর্ণনা করেছেন। (তফসীর ইবনে কাসীর)

আল্লাহ রাবুল আলামীন অন্যত্রে বলেনঃ

وَأَنْ هَذَا يَصْرِطُ إِلَى مُسْتَقِبَاتٍ فَلَّا يَشْعُورُونَ وَلَا تَشْعُرُوا أَلَّا سَبِيلٌ فَتَفَرَّقُ يُكْمَّ عن
سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَنْكُمْ بِهِ ۖ لَعْلُكُمْ تَتَّقَوْنَ

অর্থাৎ “নিশ্চয় এটিই আমার সরল পথ, সুতরাং এরই অনুসরণ কর ও বিভিন্ন পথের অনুসরণ করো না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দান করেছেন যেন তোমরা সাবধান হও।” (সূরা আনআম ১৫৩) ।

আল্লাহ যে সরল পথের প্রতি আহবান করেছেন তা হল আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর চরিত্রাদর্শ যা কুরআন ও সুন্নাহর পথ এবং পূর্ণ ইসলামের বিধান। এবং অন্যান্য বিভিন্ন বাঁকা পথ, বিরুদ্ধবাদী, অন্যাচারী ও অষ্টাচারীদের পথ যারা সরল পথ হতে দূরে সরে গেছে, যারা নিজেদের খেয়াল-খুশী ও কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে আল্লাহর দ্বানে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে।

উপরোক্ত আয়াত শরীফে বিভিন্ন (বাঁকা) পথ বলতে বিদআতীদের বিভিন্ন পথ উদ্দিষ্ট হয়েছে। যেমন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সুহল্লে একটি (সরল) রেখা টানলেন, অতঃপর বললেন, “এটা আল্লাহর সরল পথ।” তারপর ঐ রেখাটির ডানে ও বায়ে আরো অনেক রেখা টেনে বললেন, “এই হচ্ছে বিভিন্ন পথ ; যার প্রত্যেকটির উপর রয়েছে শয়তান, যে ঐ পথের দিকে

আহবান করে (দাওয়াত দিয়ে) থাকে।” অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন।

বকর বিন আলা বলেন, ‘আমার মনে হয় তাঁর উদ্দেশ্য মনুষ্যশয়তানের আহবান এবং তা হচ্ছে বিদআত।

মুজাহিদ বলেন, ‘বিভিন্ন পথসমূহের অনুসরণ করো না অর্থাৎ বিদআত ও সন্দিহান কর্মের অনুসরণ করো না।’

বিদআতীদের নিষ্পাবাদ যেমন আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে তেমনিই বহু সংখ্যক হাদিসে নবীতে তাদের অতি নিষ্পা বিবৃত হয়েছে এবং তাদের ভুঁষ্টাপাপ ও তাদের আমল অগ্রহণযোগ্যতার কথাও বর্ণিত হয়েছে। যেমন মুস্তফা সাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন : “যে ব্যক্তি আমাদের এ বিধানে আধুনিক কিছু রচনা করবে যা এর অর্তভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত। (পরিত্যাজ ও বাতিল।)” (বুখারী ৪/৩৫৫)

অন্য বর্ণনায় বলেন, “যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে যার উপর আমাদের কোন নির্দেশ নেই তবে তা নাকচকৃত ও খণ্ডিত।” (মুসলিম)

“যে ব্যক্তি হেদায়েত (সংপথের) দিকে আহবান করবে তার পুণ্য হবে ওর অনুসারীদের পুণ্যরাশির মত। তাদের কারোরই পুণ্য কিছু পরিমাণও কম করা হবে না। এবং যে ব্যক্তি ভুঁষ্টার দিকে মানুষকে আহবান করবে (বা দাওয়াত দেবে) তার পুণ্য হবে ওর অনুসারীদের পাপরাজির মত। তবে তাদের কারোই পাপ কিছু পরিমাণও কম করা হবে না।” (মুসলিম)

“কোন জাতি যখন তাদের দ্বীনে কোন বিদআত রচনা করে তখন আল্লাহ তাদের সুন্নাহ থেকে সম্পরিমাণ অংশ তুলে নেন অতঃপর তা আর তাদের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত ফিরিয়ে দেন না।” (দারেয়ী)

হওয় কওসরের পানি পান করার জন্য পিপাসার্ত লোক (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর নবী সাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হবে। কিন্তু তাদেরকে নিরুদ্দেশ উট বিতাড়িত করার ন্যায় বিতাড়িত করা হবে। তিনি বলবেন, ‘ওরা আমার দলের।’ (বা ওরা তো আমার উস্মত) বলা হবে, ‘আপনি জানেন না, আপনার বিগত হওয়ার পর ওরা কি নবরচনা করেছিল।’ তখন নবী সাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামও তাদেরকে বলবেন : “দূর হও, দূর হও।” (মুসলিম)।

তিনি আরো বলেন : “আমার পূর্বে আল্লাহর প্রেরিত প্রত্যেক নবীর জন্যই তাঁর উস্মতের মধ্য হতে বহু শিষ্য ও সহচর ছিল; যারা তাঁর আর্দ্ধশ গ্রহণ করত এবং তাঁর সর্বকাজে অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের পর তাদের পরবর্তীরা আসে যারা তা বলে যা নিজেরা করে না এবং তা করে যা করতে তারা আদিষ্ট নয়। অতএব যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে হস্ত দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন। যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে রসনা দ্বারা জিহাদ

করে সে মুমিন এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে অন্তর দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন। আর এর পশ্চাতে এক সরিষা দানা পরিমাণও ইমান থাকে না।” (মুসলিম)

“নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিদআতী হতে তওবা অন্তরিত করেছেন।”
(সিলসিলাহ সহীহাহ ১৬২০)

“যে ব্যক্তি (দ্বীনে) অভিনব কিছু রচনা করে অথবা কোন নতুনত্ব উদ্ভট রচয়িতাকে স্থান দেয় তার উপর আল্লাহ, ফিরিস্তাগণ এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ তার নিকট হতে কোন নফল ইবাদত (অথবা তওবা) এবং কোন ফরয ইবাদত (অথবা ক্ষতি পূরণ) গ্রহণ করবেন না।”

আমর বিন সালামাহ হামদানী বলেন, ফজরের নামাজের পূর্বে আমরা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ এর বাড়ির দরজায় বসে থাকতাম যখন তিনি নামায়ের জন্য বের হতেন তখন আমরা তাঁর সাথে মাসজিদে যেতাম। (একদা ঐরাপ বসেছিলাম) ইতিমধ্যে আবু মুসা আশআরী আমাদের নিকট এসে বললেন, ‘এখনো কি আবু আব্দুর রহমান (ইবনে মাসউদ) বের হন নি ? আমরা বল্লাম, না। অতঃপর তাঁর অপেক্ষায় তিনিও আমাদের সহিত বসে গেলেন। তারপর তিনি যখন বাড়ি হতে বের হয়ে এলেন তখন আমরা সকলে তাঁর প্রতি উঠে দণ্ডযামান হলাম। আবু মুসা আশআরী তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান ! আমি মসজিদে এক্ষনি এমন কাজ দেখলাম যা অস্তুত বা অভূতপূর্ব। তবে আলহামদুল্লাহ, আমি তা ভালই মনে করি। তিনি বললেন, ‘কি সেটা ? ’ (আবু মুসা) বললেন, ‘যদি বাঁচেন তো দেখতে পাবেন ; আমি মসজিদে এক সম্প্রদায়কে এক-এক গোল বৈঠকে বসে নামায়ের প্রতীক্ষা করতে দেখলাম। তাদের হাতে রয়েছে কাঁকর। প্রত্যেক মজলিসে কোন এক ব্যক্তি অন্যান্য সকলের উদ্দেশ্যে বলছে, ‘এক শ’বার “আল্লাহ আকবার” পড়, তা শুনে সকলে শতবার তকবীর পাঠ করছে। লোকটি আবার বলছে, ‘এক শ’বার “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” পড়,’ তা শুনে সকলেই শতবার তাহলীল পাঠ করছে। আবার বলছে, ‘এক শ’বার “সুবহানাল্লাহ” পড়,’ তা শুনে সকলেই শতবার তসবীহ পাঠ করছে।’ তিনি (ইবনে মাসউদ) বললেন, ‘আপনি ওদেরকে কি বললেন?’ আবু মুসা বললেন, আপনার রায়ের অপেক্ষায় আমি ওদেরকে কিছু বলিনি। তিনি বললেন, ‘আপনি ওদেরকে নিজেদের পাপ গণনা করতে কেন আদেশ করলেন না এবং ওদের পুণ্য বিনষ্ট না হবার উপর জামানত কেন নিলেন না?’

আমর বলেন, অতঃপর আমরা তাঁর সহিত চলতে লাগলাম। তিনি ঐ সমস্ত গোল বৈঠকের কোন এক বৈঠকের সমুখে পৌঁছে দণ্ডযামান হয়ে বললেন, ‘আমি তোমাদেরকে একি করতে দেখছি ? ’ ওরা বলল, ‘হে আবু আব্দুর রহমান ! কাঁকর, এর দ্বারা তকবীর তহলীল ও তসবীহ গণনা করছি।’ তিনি বললেন, ‘তোমরা তোমাদের

পাপরাশি গণনা কর, আমি তোমাদের জন্য জামিন হচ্ছি যে, তোমাদের কোন পুণ্য বিনষ্ট হবে না। ধিক তোমাদের প্রতি হে উম্মতে মুহাম্মদ ! কি সত্ত্ব তোমাদের ধ্বংসের পথ এল ! তোমাদের নবীর সাহাবাবৃন্দ এখনও যথেষ্ট রয়েছেন। এই তাঁর বস্তু এখনো বিনষ্ট হয়নি। তাঁর পাত্র সমূহ এখনো ভগ্ন হয়নি। তাঁর শপথ যাঁ'র হাতে আমার প্রাণ আছে, তোমরা এমন মিলাতে আছ যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর মিলাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, অথবা তোমরা প্রষ্ঠাতার ঘার উদ্ঘাটনকারী ?! ওরা বলল, ‘আল্লাহর কসম, হে আবু আব্দুর রহমান! আমরা ভালোরই ইচ্ছা করেছি’ তিনি বললেন, ‘কিন্তু কত ভালোর অভিলাষী ভালোর নাগালই পায়না ! অরশ্যই আল্লাহর রসূল আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, “এক সম্পদায় কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তাদের ঐ পাঠ (তেলাঅত) তাদের কঠ অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম হতে বহিগত হবে যেমন তীর শিকার হতে বহিগত হয়ে যায়া” এবং আল্লাহর কসম, জানি না, সম্ভবতঃ তাদের অধিকাংশই তোমাদের মধ্য হতে। অতঃপর তিনি সেখান হতে প্রস্থান করলেন। আমর বিন সালামাহ বলেন, ‘নহরওয়ানের দিন ঐ বৈঠক সমূহের অধিকাংশ লোককেই খাওয়ারেজদের সহিত দেখে ছিলাম। যারা আমাদের (হয়রত আলী ও অন্যান্য সাহাবাদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ লড়ছিল। (সিলসিলাহ সহিহাহ ২০০৫)

অধিকাংশ বিদআতীর বিদআত রচনায় কিছুটা অথবা সম্পূর্ণ সন্দুদ্দেশ্য থাকে। কোন সৎ কাজ করছে মনে করেই নতুন কোন ধর্মীয় কর্ম বিরচিত করে। কুরআনের (বিশেষ করে সিফাতের) আয়াত সমূহের অপব্যাখ্যা ও ভূল তাৎপর্য করে। অনেক ক্ষেত্রে স্পষ্ট অর্থ ত্যাগ করে নিজের জ্ঞান ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন কূটার্থ উদ্ভাবন করে। হক ও বাতিলের মাঝে খামখা সময় ও সম্পূর্ণি সাধন করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের নিদেশিত পথ ব্যতিরেকে ভিন্ন পথে কল্যাণ অন্বেষণ করে। এই ধরনের কিছু কপট মানুষদের উদ্দেশ্যে আল্লাহপাক বলেন :

تَأْتِيَّةً أَلَّذِينَ هَمَّتْهُمْ أَطْبَعُوا اللَّهَ وَأَطْبَعُوا الرَّسُولَ وَأَقْبَلَ
الْآخَرُ مِنْ خَمْثَ قَلْبِنَ تَقْرِئُ عَشَمَ فِي شَرْبَعِ قَرْدَوَهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ إِنَّ
حُكْمَهُمْ فَلَمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَأَلَّا يُؤْمِنُوا بِالْأَخْيَرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْيَرُنَ فَأُولَئِكَ ⑩
أَلَّمْ يَرَ إِلَى الْأَذْيَنَ قَرْعَمْنَوْنَ أَكْفَمْهُمْ هَمَّتْهُمْ أَطْبَعُوا وَعَمَّا أَدْرَلَنَ إِلَيْكَ وَمَا
أَدْرَلَنَ يَمِنْ قَطِيلَكَ بِرِيشْنَوْنَ أَنْ تَخْحَاتِمْقَ إِلَى الْمَطْبَعَوْتَ وَقَدْ أَمْرَوْا
أَنْ يَخْفِنْوَا بِهِ وَمِنْهُمْ الْقَيْطَنْدَنَ أَنْ يَعْلَمْنَمْ حَلَلَلَ بِعِيمَداً ⑪

فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَقَالُوا إِنَّ مَا أَخْرَلَ اللَّهُ قَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ
تَعْذِيْلُونَ عَنْكَ حَسْنَوْنَا ⑩ فَكَيْفَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَتْهُمْ مُّعْصِيْلِيْنَ بِمَا قَدْمَكَ
أَنْدِيْمُومْ ثُمَّ جَاءَكُوكَ تَعْلِمُونَ بِاللَّهِ إِنَّ أَزْدَادَنَا إِلَّا إِحْسَنَنَا وَتَوْفِيقَنا
أَذْنِيْكَ الْجِنَّتَ تَعْلِمُ اللَّهُ مَا فِي قَلْبِيْمُ فَأَغْرِيْمُ عَنْقَمُ وَجْهَنَّمَ وَقُلْ لَهُمْ
فَتَأْنِيْسُهُمْ قُوَّلَا بِلِسَنَا ⑪

অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের শাসক (আমীর ও ওলামা) দের অনুগত হও, আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে তবে সে বিষয়ে আল্লাহ ও রসূলের (কিতাব ও সুন্নাহর) ফায়সালা নাও। এটিই ভালো এবং ব্যাখ্যায় (পরিগামে) প্রকৃষ্টতর। (হে মুহাম্মদ !) তুমি কি তাদের দেখনি যারা ধারণা করে যে তোমার প্রতি যা অবর্তীণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবর্তীণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অর্থাৎ তারা তাণ্ডতের (আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন আরাধ্য ও মান্য বস্তু যেমন, মূর্তি, কবর, মাধ্যার, ঝুটা আউলিয়া, মনগড়া কানুন, শয়তান, মন ও প্রবৃত্তি প্রভৃতির)কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়-যদি ও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং শয়তান তাদেরকে ভীষণ ভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। তাদেরকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবর্তীণ করেছেন তার দিকে এবং রসূলের দিকে (কিতাব ও সুন্নাহর দিকে) এস, তখন তুমি কপটদেরকে তোমার নিকট থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখবে। সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য যখন তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন তাদের কি অবস্থা হয়? অতঃপর তোমার নিকট আল্লাহর শপথ করে বলবে যে, আমরা কল্যাণ ও সম্প্রীতি সাধন ব্যতীত অন্য কিছুই চাইনি। এরাই তো তারা যাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাদেরকে সন্দুপদেশ দাও এবং তাদেরকে গোপনে গভীর কথা বল। (সূরা নিসা ৫৯ - ৬৩)

আয়াতের মনগড়া অর্থ ও ব্যাখ্যাকারী এক সম্প্রদায় সমূক্ষে সতর্ক করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই কুরআনের ব্যাখ্যার উপর লড়বে যেমন আমি ওর অবতরণের উপর লড়ছি।” (মুসনাদে আহমদ, নাসাই, ইবনে হিবান)

বিদআতের সংজ্ঞার্থ

বিদআতের আতিথানিক অর্থ ; বিনা নমুনা বা উদাহরণে কিছু রচনা বা উন্নাবন করা বা আবিষ্কার করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

جَدِيدُ الْسَّمْنَوَاتِ وَالْأَزْرِقِ

অর্থাৎ “আল্লাহ” আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর আবিষ্কর্তা।” অর্থাৎ বিনা নমুনায় সৃষ্টি কর্তা।” (সূরা বাকারাহ ১১৭)

বলা হয় বিদআহ করেছে ; অর্থাৎ এমন পথ বা প্রথা রচনা করেছে পূর্বে যার কোন উদাহরণ ছিল না। যেমন যে ঘটনা বা কাঙ পূর্বে কখনো ঘটেনি তাকে বলা হয় ‘অভূতপূর্ব ঘটনা।’

এই সকল অর্থের প্রতি খেয়াল করে বিদআতকে ‘বিদআত’ বলা হয়েছে। সুতরাং এমন ধর্মীয় বিশ্বাস, কথা বা কাজ যার কোন দলীল শরীয়তে নেই। এই বিদআতীর পূর্বে আল্লাহর রসূল অথবা তাঁর কোন সাহাবা বলেন নি বা করেন নি, যার কোন ইঙ্গিত দ্বানে বা কোরআনে অথবা সহীহ সুন্নাহতে নেই-নতুন ভাবে তাই বিশ্বাস করা, বলা বা করাকে-যা আসল শরীয়তের সমতুল্য মনে করা হয় এবং অতিরিক্ত করে তা পালনীয় ধর্মীয় স্থিতি সুরূপ করার উদ্দেশ্যে হয়-তাকে বিদআত বলে।

অন্য কথায়, প্রত্যেক সেই আমল (ইবাদত মনে করে বা আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে মনে করে বা শরীয়ত ভেবে বা করতে হয় অথবা নেই ভেবে, নেকী বা গোনাহ হয় মনে করে) করা বা ত্যাগ করা যার নির্দেশ বা ইঙ্গিত দ্বানে নেই তাকে বিদআত বলে। (হজাজ কাবিয়্যাহ)

অতএব যে আমলের মূল দ্বীন বা শরীয়তে আছে এবং কিছুকাল পরে তার নতুন ভাবে সংস্কার সাধন করা হয় তবে তাকে আভিধানিক অর্থে ‘বিদআহ’ বললেও শরীয়তী অর্থে ‘বিদআত’ নয়। যেমন কিছু সলফের উক্তি “নে’মাতিল বিদআহ” (উভয় আবিষ্কার বা বিদআহ) শরীয়তী অর্থে বিদআত নয়। হ্যরত ওমর রায়িআল্লাহু আনহ যখন সমস্ত লোকদেরকে রম্যানের তারাবীহ পড়ার জন্য একই দ্বিমামের পশ্চাতে একত্রিত করলেন এবং সকলকে একই দ্বিমামের পিছনে জমায়েত হয়ে নামায পড়তে দেখলেন তখন তিনি বললেন, ‘নে’মাতিল বিদআতু হাযিহ’ (অর্থাৎ উভয় আবিষ্কার এটা!) এটা আভিধানিক অর্থে বিদআহ। কারণ রম্যানে জামায়াত করে তারাবীহের নামায পড়ার মূল ভিত্তি শরীয়তে ছিল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নিজে সাহাবাবৃদ্ধকে নিয়ে জামায়াত করে দুই বা তিন রাত্রি তারাবীহের নামায পড়েছিলেন। তারপর ঐ নামায উক্ততের উপর ফরয হয়ে যাবে এবং তা আদায় করতে তারা অক্ষম হবে-এই আশংকায় আর কোন দিন জামায়াত করে পড়েননি। সুতরাং তা শরয়ী অর্থে বিদআত নয়। পক্ষান্তরে হ্যরত ওমরের বা অন্যান্য খলীফা ও সাহাবার কর্মও সুন্নাহ।

সতর্কতার বিষয় এই যে, হ্যরত ওমর রায়িআল্লাহু আনহ বা খুলাফায়ে রাশেদীন রায়িআল্লাহু আনহমদের কোন কাজের দোহাই দিয়ে বিদআত করা বা নবী

সাল্লাহুর আলাইহি অসাল্লামের পরে তাঁদের কোন কর্মকে তাঁদের পরর্বতী যুগে কোন নতুন ধর্মীয় কাজ বা প্রথা রচনা করার উপর দলীল মনে করা যাবে না। তাই একথা কারো মনে করা উচিত নয় যে, হ্যারত ওসমান রাখিয়াল্লাহ আনহ সমস্ত কুরআনী আয়াতকে জমা করে মুসহাফ বা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন যা এক নতুন কাজ ছিল তাই আমাদেরও ঐ ধরণের কোন অন্য কাজ করা চলবে, অথবা তাঁদের ঐ ধরণের কর্মগুলি বিদআত ছিল। কারণ আল্লাহর রসূল সাল্লাহুর আলাইহি অসাল্লামের কথামত প্রমাণিত যে, তাঁদের যে কোনও কাজ সুন্নাহ বিদআত নয়। যদি তা তাঁর নির্দেশের পরিপন্থী না হয়। অতএব তাঁদের নির্দেশিত বা কৃতকর্মের আমরা অনুসরণ করতে পারি; কিন্তু তাঁতে কোন অতিরিক্ত অথবা তাঁদের রচনার অনুকরণে কোন অন্য নতুন কর্ম রচনা করতে পারি না। আবার কোন দেশচার, লৌকিক বা কোন বৈষয়িক কাজ (ধর্ম না ভেবে করাকে) অভিধানিক অর্থে বিদআহ বলা হলেও শরীয়তের পারিভাষিক অর্থে তা ‘বিদআত’ নয় এবং রসূল সাল্লাহুর আলাইহি অসাল্লামের উদ্দেশ্য ঐ ধরণের কর্মের উপর সতর্ক করাও নয়। অবশ্য ঐ সমস্ত প্রথা বা কর্ম শরীয়ত পরিপন্থী হলে সে কথা ভিন্ন।

তদন্তুরপ কোন বৈষয়িক বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও শরয়ী অর্থে বিদআত নয়। তা সাধারণ কর্মে অথবা দীন ও ইবাদতের অসীলাহ ও মাধ্যম সূরুপ ব্যবহার করাও বিদআতের পর্যায়ে পড়েন। যেমন আয়ান, নামায বা খোতবার জন্যে লাটউড স্পীকার, বিদ্যুৎ বাতি, শিফার অভিনব ব্যবস্থা ইত্যাদিকে বিদআত বলতে পারি না।

মোটকথা যদি কোন ব্যক্তি (রসূল বা সাহাবার যুগে) কোন অভূত কর্মকে পরবর্তীকালে ইবাদত ও আল্লাহর সামীপ্যাদাতা ভেবে অথবা এতে নেকী আছে ভেবে করে অথবা এতে পাপ আছে মনে করে ত্যাগ করে তবে তা নিঃসন্দেহে বিদআত।

পক্ষান্তরে যদি কোন কাজ ইবাদত বা নৈকট্য দানকারী না ভেবে করা হয় তবে তার তিন অবস্থা হতে পারে;

১- সে কাজের কোন স্পষ্ট নির্দেশ শরীয়তে না থাকলেও তা ব্যাপক অর্থ ও মৌলিক নীতির অর্তভুক্ত হবে। অস্পষ্ট বা পরোক্ষ ইঙ্গিত থাকলে তা বিদআত বলে গণ্য হবে না। বরং তা ঐ মূল অর্থ অনুযায়ী ঐ নির্দেশ ওয়াজের হলে ঐ কর্ম ওয়াজের নচেৎ মুস্তাহব অথবা হারাম হবে।

২- সে কাজের প্রতি অস্পষ্ট ও কোন ইঙ্গিত শরীয়তে পাওয়া যাবে না এবং তা মৌলিক নীতি বা ব্যাপক দলীলেরও আওতাভুক্ত নয়। বরং সে বিষয়ে শরীয়ত নীরব। তাহলে তা মুবাহ। অর্থাৎ তাঁতে পাপ-পুণ্য কিছুই নেই।

৩- সে কাজ ব্যাপক কোন দলীলের বা মৌলিক নীতির অর্তভুক্ত নয় এবং এ বিষয়ে শরীয়ত নীরব। কিন্তু তা ইবাদত বা আমলের ক্ষেত্রে অসীলাহ ও মাধ্যম মাত্র

তাহলে তা যে কাজের অসীলা তার হিসাবে অসীলারও গুরুত্ব হবে। যেমন তবলীগ বা ইসলাম প্রচারের জন্য রেডিও, টি ভি, টেপরেকর্ডার, আয়ান, জলসা বা দর্শের জন্য মাইক ইত্যাদি- আমলের সহায়ক যন্ত্রাদি ব্যবহার করা। বিদআতের পর্যায়ে পড়ে না। (ফারায়েদুল কাওয়ায়েদ, ইবনে উসাইমীন ১৪৪ - ১৪৫ পৃঃ)

বিদআতের প্রকার

বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টি কোণ থেকে বিদআতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় ; বিদআহ হাকীকিয়াহ (প্রকৃত বিদআত) এবং বিদআহ ইয়াফিয়াহ (অতিরিক্ত বিদআত)।

প্রকৃত বিদআত তখন বলা হয় যখন ধর্ম-কল্প কাজের ভিত্তি কিতাব, সুন্নাহ অথবা ইজমাতে পাওয়া যায় না। বরং ভিত্তিহীন ভাবেই সে কাজকে দীন বলে মেনে নেওয়া হয়। যেমন কোন সন্দিহানে পড়ে বিনা কোন শরয়ী ওয়র অথবা সংউদ্দেশ্যে কোন হালাল বস্তুকে হারাম অথবা হারাম বস্তুকে হালাল করা। যেমন, বৈরাগ্য অবলম্বন করা, মাছ-মাংসাদি উত্তম খাদ্য ভক্ষণ না করা, উত্তম পরিচ্ছন্দ পরিহার করা প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বিবাহ না করা ইত্যাদি। আস্থাকে কষ্ট দিয়ে (যেমন দেহে কাঁটা, জিভে শিক ফুঁড়ে আল্লাহর নৈকট্য আশা করা, জ্যান্ত কবর নিয়ে মাটির উপর হাত বের করে তসবীহ পড়া, মর্সিয়া-মাতমে বুকচিরা, পিঠে চাবুক মারা প্রভৃতির মাধ্যমে) ইবাদত করা বা নেকী লাভের আশা করা।

হ্যরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রায়িয়াল্লাহ আনহ বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত জিহাদে (সফরে) থাকতাম এবং আমাদের সঙ্গে আমাদের পত্নীরা থাকত না। (দীর্ঘ সফরের ফলে যৌনজুলা অনভূত হলে) আমরা তাঁকে বললাম, ‘আমরা খাসি করব না কি?’ তিনি আমাদেরকে তাতে নিষেধ করলেন এবং বক্সের পরিবর্তে (সফরে) কোন নারীকে বিবাহ করতে অনুমতি দিলেন। অতঃপর এই আয়াত পাঠ করলেন :

يَأَيُّهَا الْبَنِينَ إِذَا مَأْتُمُوا لَأَتْخِرِّمُوا طَيِّبِتُ مَا أَخْلَى اللَّهُ تَكْبُمُ وَلَا تَعْنَدُوْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْتَدِينَ

অর্থাৎ “ হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সব উৎকৃষ্ট বস্তু বৈধ করেছেন সে সকলকে তোমরা ঔবেধ করো না। সীমালংঘনকারীদেরকে আল্লাহ মোটেই ভাল বাসেন না। ” (সূরা মায়েদাহ ৮৭, বুখারী ৮/২৭৬)

আবু কইস বিন হায়েম বলেন, হ্যরত আবু বকর রায়িয়াল্লাহ আনহ আহ এসের যমনাব নামক এক মহিলার নিকট প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁকে দেখলেন, কে, কথা বলে না। জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ব্যাপার কি ওর, কথা বলে না কেন ?’ সকলে বলল,

‘নীরব থেকে হজ্জ করতে চায়।’ তিনি মহিলাটিকে বললেন, ‘কথা বল, কারণ এটা বৈধ নয়। এমন করা জাহেলিয়াতের কাজ।’ মহিলাটি তখন কথা বলতে শুরু করল; বলল, ‘আপনি কে?’ তিনি বললেন, ‘মুহাজেরীনদের একটি লোক।’ (বুখারী ৭/১৪৭)

তদনুরাগ এমন মনগড়া ইবাদত রচনা করা যার বিধান আল্লাহ তাআলা দেননি। যেমন বিনা পরিভ্রাতায় নামায পড়া, কাওয়ালী, গান-বাজনা প্রভৃতির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়া ইত্যাদি। অনুরূপ ভাবে শরীয়তে সুন্নাহকে দলীল মানতে অসুৰীকার করা, শুন্দি বর্ণনার উপর জ্ঞান ও বিবেককে প্রাধান্য দেওয়া এবং জ্ঞানের নিষ্ক্রিয়তে শরীয়তকে ওজন করা ইত্যাদি।

তদনুরাগ হাকীকত তরীকত বা মারেফত ইত্যাদি নতুন পথ রচনা করা বা মান্য করা। নিদিষ্ট ধর্মীয় মর্যাদা (বা কামালে) পৌছে গেলে-আমল ওয়াজের হওয়ার শর্তাবলী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আর কোন আমল এই কামেলের উপর ওয়াজের নেই ভাব। অথবা মারেফতীর সেই মঞ্জিলে পৌছে গেলে বাস্তুর নিকট হারাম-হালাল সব একাকার হয়ে যায়, তখন আর তাকে শরীয়তের বাধা মেনে চলতে হয় না, ব্যতিচার, শুয়োর, কুকুর মাদক দ্বয় ইত্যাদি হারাম বস্তু তার জন্য হালাল হয়ে যায় এই ধারণা করা অথবা কোন মরিমিয়া তত্ত্বানুসন্ধান করা ইত্যাদি।

অতিরিক্ত বিদআত তখন হয়, যখন আসল আমল তো বিধেয় থাকে কিন্তু ঐ বিধেয় কর্মের সাথে আরো কিছু অতিরিক্ত কর্ম মনগড়া ভাবে যুক্ত করে দেওয়া হয়। যার ফলে পুরো কর্মটাই অবিধেয় বিদআত বলে বিবেচিত হয়। লোক মাঝে অধিকাংশ এই বিদআতেরই প্রচলন বেশী। যেমন নামায, রোয়া, যিকর, দুআ, দরজ, কষ্টের সময় পূর্ণ অযু প্রভৃতি বিধেয় ইবাদত। যে সবের বিধান শরীয়তে রয়েছে। কিন্তু কেউ যদি বলে, আমি এক রাকাআতে একশব্দার কুল পড়ে অথবা প্রতি রাকআতে তিন বার করে সিজদা করে নামায পড়ব, রৌদ্রে কষ্ট ভোগ করে ছায়া থাকা সত্ত্বেও গ্রহণ না করে রোয়া করব। বছরের তিনশ' পঁয়ষট্টি দিনই রোয়া রাখব। একত্রিত হয়ে সমস্তেরে জামাআতী যিকর করব, যেখানে বিধেয় নয় সেখানে একত্রে হাত তুলে জামাআতী দুআ করব। জামাআতবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্তেরে দরজ পড়ব ইত্যাদি তবে সে বিদআতী। অযুর সময় অতিরিক্ত বিদআত যেমন, কোন ব্যক্তির নিকট গরম পানি মজুদ আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কঠিন শীতের সময় অতি শীতল পানি দ্বারা অযু করা উত্তম মনে করে এবং ঐ পানি দ্বারা অযু করে আত্মাকে কষ্ট দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করে।

সুতরাং নামায, রোয়া, যিকির প্রভৃতি শরীয়ত সম্বন্ধ (ফরয) ইবাদত যা পালন করতে বাস্তু আদিষ্ট হয়েছে, যা আদায় করতে তাকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে এবং তার বিনিময়ে মহাপৃণ্য লাভের প্রতিশ্রুতিও দান করা হয়েছে। কিন্তু তার সহিত

পালনের অতিরিক্ত মনগড়া পদ্ধতি ও প্রণালী সম্পর্কে কোন নির্দেশ তাকে দেওয়া হয়নি। তাই যেমন ভাবে তাকে তা পালন করতে বলা হয়েছিল ঠিক তেমনি ভাবে তা তার করা উচিত ছিল। তা না করে সুক্ষেপে পদ্ধতিতে শরীয়তের উপর সংশোধন ও সংযোজন সাধন করার অপচেষ্টা ও দৃঃসাহসিকতা করে! অথচ আল্লাহ বলেন, “আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বিনকে আমি পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।”

হ্যরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রায়িআল্লাহ আনহ একদল মানুষকে একত্রে সমস্যার যিকর করতে দেখে বললেন, “অবশ্যই তোমরা সীমা লংঘন করে (যিকর করার) এক অভিনব পদ্ধা (বিদআত) রচনা করেছ, অথবা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহচর বৃন্দ অপেক্ষা তোমরা নিজেদেরকে ইলমে অধিক বড় মনে করেছ। নিশ্চয় তোমরা এ ভুষ্টার পাপের জন্য ধৃত হবে।”

অনুরূপ ভাবে নবীদিবসের বিদআত; অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজেব।” কোন মানুষই ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার আপন প্রাণ, সন্তান, পিতা এবং সকল মানুষ (বরং সকল সৃষ্টি) অপেক্ষা তাঁকে অধিক ভালবেসেছে।” (বুখারী)

কিন্তু সংসারে প্রত্যেক ভালোবাসা বা প্রেমের এক এক রকম ভিন্ন-ভিন্ন ভাব ও ধরন আছে। বিশ্বপ্রিয় নবী হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ভালোবাসার ধরন, তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর কথার অনুসরণ করা, তাঁর আদর্শে আদর্শবান হওয়া, তাঁর প্রত্যেক নির্দেশ পালন করা প্রত্যেক নিষিদ্ধ কর্ম হতে বিরত থাকা, তিনি বিদআত (বা দ্বিনে অভিনব পথ রচনা) করতে নিষেধ করেছেন তা মান্য করা।

যদি এসব কেউ করতে পারে তবে সত্যই সে নবীর যথৰ্থ প্রেমিক বা ভক্ত। নচেৎ যে কেবল মুখে প্রেমের দাবী করে, লোক সমাজে প্রচার করে এবং প্রিয়তমের মন ও আদেশের প্রতিকূল চলে সে এক কপট ভঙ্গ প্রেমিক ব্যক্তিত কিছু নয়। হ্যাঁ, নবীদিবস এক অভিনব রচিত নবীপ্রেম-বিকাশ পদ্ধতি। যার কোন নির্দেশ অথবা ইঙ্গিত তিনি দেন নি। তাঁর একান্ত ভক্তি সাহাবাবৃন্দও ঐ দিবস পালন করে তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেমের প্রমাণ ও পরিচয় দিয়ে যাননি। অথচ তাঁরা এই ধর্মধর্মজীদের চেয়ে কত শতগুণ অধিক তাঁর কথার অনুসরণ করতেন, তাঁকে তায়ীম ও ভক্তি করতেন এবং তাঁদের পরে কোন আহলে সুন্নাহর ইমামও এ পদ্ধতি প্রসঙ্গে কোন ইঙ্গিত দেননি। এই প্রেম প্রণালী বা ভক্তি প্রকাশের ‘ফ্যাশন’ রাফেয়াহ, ফাতেমী বা উবাইদী ফির্কার লোকেরা আবিষ্কার করে মুসলিম সমাজে প্রচলিত করেছে। যে ফাতেমীদের প্রকৃত বংশধারা সুলামিয়ার এক জন ইয়াহুদী হতে শুরু হয়।

এই নবীদিবস প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) বলেন, ‘খীষ্টানদের অনুকরণে অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মহবতে (অতিরঞ্জনে) কিছু লোক তাঁর জন্ম দিনটিকে ‘নবী দিবস’ কর্পে ঈদের মত পালন করে থাকে। অথচ তাঁর জন্মদিন প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। (অনেকে বলেছেন ১২ রবিউল আওয়াল। কিন্তু সর্বসম্মত অভিমতে তাঁর মৃত্যু দিন এই তারিখেই। তাই এই দিনে জন্মের খুশী মানালে তাঁর মৃত্যুর দিনে খুশী করা হয়। আবার মৃত্যুর শোক পালন করলে জন্মের শুভ আনন্দের পরিপন্থী হয়।) পরন্তু এই দিনটিকে অথবা নবীদিবস নামে কোন ঈদ সলফদের কেউই পালন করে যাননি। (তাঁরা তো কেবল দুটি ঈদই জানতেন)। অথচ যদি এই ঈদ পালনে কোন মঙ্গল থাকত তবে আমাদের চেয়ে তাঁরাই তার অধিক হকদার হতেন। (আমাদের পূর্বে তাঁরাই বেশী কর্পে পালন করে যেতেন।) কারণ আমাদের চেয়ে তাঁদের হাদয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মহবত ও তাঁয়ীম বহগুণ অধিক ছিল এবং আমাদের অপেক্ষা তাঁরাই অধিক কল্যাণকর ও পৃণ্যময় কর্মের খোজ ও আশা রাখতেন।

পক্ষান্তরে প্রকৃত মহবত ও প্রেমের পরিচয় তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণে, তাঁর আদেশ পালনে, তাঁর সুন্নাহ ও আদর্শ দ্বারা জীবন ও চরিত্র গঠনে, তাঁর আনীত শরীয়ত প্রচারে এবং এর উপরে নিজ হস্ত, রসনা ও অস্তর দ্বারা জিহাদে প্রকাশ পায়। মহবত প্রকাশের এই পদ্ধতিই প্রাথমিক অগ্নানুসারী মুহাজেরীন ও আনসারদের এবং যাঁরা শুন্দিচিতে তাঁদের অনুগমন করেছেন তাঁদের।’ (ইকত্তিয়াউস সিরাত্তুল মুসতাকীম)

বিদআতকে ভিন্ন আরো তিন ভাগে বিভক্ত করা হয় : ১- এতেকাদিয়াহ (বিশ্বাসগত) ২- কওলিয়াহ (কথাগত) এবং ৩-আমালিয়াহ (কর্মগত)।

১- বিশ্বাসগত বিদআত তখন হয় যখন কোন কিছুর উপর কারো বিশ্বাস রসূল ও সাহাবার বিশ্বাসের পরিপন্থী হয়। যেমন খাওয়ারেজদের বিশ্বাস ; কোন মুসলিম কর্বীরাহ গুনাহ (চুরি, চুগলী, হত্যা ইত্যাদি)করলে কাফের হয়ে চিরস্থায়ী জাহানামবাসী হবে। তাই তারা অনেক সাহাবাদেরকেও কাফের মনে করে থাকে। অথচ আহলে সুন্নাহর মতে সে ব্যক্তি কাফের হয় না। পাপের পরিমাণ মত নরকে শান্তি ভোগ করে স্টামানের কারণে একদিন জাহানাতবাসী হবে। অথবা আল্লাহই ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করে জাহানতে দেবেন।

যেমন অনেকের বিশ্বাস ; আল্লাহ সব জায়গায় বিদ্যমান। অথচ আল্লাহ আছেন সম্পূর্ণকাশের উপর আরশে। তাঁর ইলম আছে সর্বত্রে। তদনুরূপ এই বিশ্বাস যে, মানুষের কর্ম মানুষেরই সৃষ্টি, আল্লাহর সৃষ্টি নয়, অথবা কর্মে মানুষের কোন এখতিয়ার নেই প্রভৃতি।

২- কথাগত বিদআত তখন হয়, যখন এমন কথা বলা ও প্রচার করা হয় যা কিতাব ও সুন্নাহর বিপরীত। যেমন বিভিন্ন ফির্কা-রাফেয়াহ, খাওয়ারেজ, জাহমিয়্যাহ, মুতায়েলাহ, আশআরিয়াহ প্রভৃতিদের কথা। যারা কিতাব ও সুন্নাহর মৌলনীতি বর্জন করে সাহাবায়ে কেরামগণের সমব ও তরিকা প্রত্যাখ্যান করে উভয়ের অপব্যাখ্যা ও ভুল অর্থ মনগড়াভাবে করে থাকে এবং আহলে সুন্নাহ তথাদুনিয়ায় কিয়ামত পর্যন্ত হক ও ন্যায়ের সপক্ষে জিহাদে তায়েফাহ মানসূরাহ' (সাহায্য প্রাপ্ত গোষ্ঠী) এবং আখেরাতে 'ফিরকাহ নাজিয়াহ' (মুক্তি প্রাপ্ত সম্প্রদায়) এর বিরোধিতা করে থাকে। যারা সাহাবাদেরকে গালি দেয়, কেউ কৰীরাহ গোনাহ করলে তাকে কাফের ও চির-জাহানামী বলে। আল্লাহর মহিমান্বিত গুণাবলীর তাৎীল ও অপব্যাখ্যা অথবা অসীকার করে ইত্যাদি।

৩- কর্মগত বিদআত তখন হয়, যখন এমন কোন কাজ দ্বীন ভেবে বা করতে হয় ভেবে করা হয় যা শরীয়তে বর্ণিত কাজ ও তার পদ্ধতির প্রতিকূল হয়। যেমন শবেবেরাত, শবেমিরাজ, মুহাররাম, চালসে প্রভৃতি পালন করা।

বিদআতের প্রতিক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য করে তাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় :

(ক) বিদআহ মুকাফ্ফিরাহ,(খ) গায়র মুকাফ্ফিরাহ।

(ক) মুকাফ্ফিরাহ বিদআত তখন বলা হয়, যখন ঐ বিদআত করার ফলে বিদআতী কাফের বলে গণ্য হয়। যেমন সর্ববাদিসম্মত কোন দ্বীনী অনুশাসনকে অসীকার করা, কোন ফরয কর্মকে অসীকার করা, অথবা যা ফরয নয় তাকে ফরয করে নেওয়া, সর্বসম্মত কোন হালাল বস্তুকে হারাম অথবা তার বিপরীত করা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অথবা কিতাব প্রসঙ্গে এমন বিশ্বাস রাখা যা হতে আল্লাহ, রসূল এবং কিতাব পরিত্র। যেমন আল্লাহর পুত্র আছে ভাবা, রসূলকে আল্লাহ মনে করা (আহমদকে আহাদ মনে করা), কুরআনকে মখলুক (সৃষ্ট) মনে করা ইত্যাদি। তদনুরূপ কবর বা আস্তানা পূজা করা এবং জাহানাত, জাহানাম তকদীর, ফিরিশ্তা প্রভৃতি অসীকার ও অবিশ্বাস করা ইত্যাদি।

(খ) গায়র মুকাফ্ফিরাহ বিদআত তখন বলা হয়, যখন বিদআত করে বিদআতী তার কারণে কাফের হয়ে যায় না, তবে পার্শ্ব নিশ্চয় হয়। যেমন নিদিষ্ট সময় হতে নামায দেরী করে পড়া, ঈদের নামাযের পূর্বে খোতবাহ পড়া, বিভিন্ন পর্ব ও ঈদের উদ্বাবন করা ইত্যাদি।

প্রকাশ যে, বিদআতে হাসানাহ (যে বিদআত কোন উপকার ও মঙ্গলের খাতিরে রচনা করা হয়) বলে কোন বিদআত নেই, যা করলে পাপ না হয়ে পুণ্য লাভ হয়, অথবা তা মুবাহ। বরং দ্বীনে প্রত্যেক নবীন বিরচনই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই সাইয়েআহ ও ভষ্টতা।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জুমআর খুতবায় বলতেন, “নিশ্চয়ই সর্ব শ্রেষ্ঠ কথা আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম হেদায়েত (পথনির্দেশ) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হেদায়ত। সর্ব নিকৃষ্ট বিষয় যাবতীয় অভিনব রচিত বিষয়, প্রত্যেক অভিনব রচিত বিষয়ই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই পথপ্রস্তুতা।” অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, “এবং প্রত্যেক পথপ্রস্তুতাই জাহাঙ্গামে।”

সতর্কতার বিষয় যে, হাদীস শরীয়তে বলা হয়েছে, “যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম সুন্নাহ (পথ বা রীতি রচনা বা) চালু করে, তার জন্য রয়েছে ঐ সুন্নাহর সওয়াব এবং তার সওয়াবও যে ঐ সুন্নাহর উপর আমল করে”

এর অর্থ এ নয় যে, যদি কেউ শরীয়তে কোন উত্তম কর্ম বা প্রথা নতুন ভাবে প্রচলন করে তবে সে ঐ সওয়াবের অধীকারী হবে। বরং এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কোন বিধিসম্মত উত্তম কাজ প্রারম্ভ করে এবং তার দেখাদেখি অন্যান্য লোক সেই কাজ করে, অথবা কোন সুন্নাহর সংস্কার করে ; অর্থাৎ যা আসলে সুন্নাহ ও দ্বীনী রীতি, কিন্তু তার উপর কেউ আমল না করার ফলে তা মৃতপ্রায় থাকে এবং কেউ এসে তা পুনর্জীবিত করে, অথবা এমন পদ্ধতি ও পথ আবিষ্কার করে যা আসলে ধর্ম বা সুন্নাহ না হলেও তা ধর্মের অঙ্গীলা বা মাধ্যম, যেমন মাদ্রাসা নির্মাণ, বই-পুস্তক ছাপা ইত্যাদি, তাহলে তার জন্য ঐ সওয়াবও রয়েছে।

সুতরাং এ ধরনের কর্ম বা সুন্নাহ মানুষ নিজের তরফ থেকে বিরচন করে না বরং তার সংস্কার বা বৈধ উন্নয়ন সাধন করে যা উত্তম কাজ এবং তা বিদআত নয়।

বিদআতী প্রসঙ্গে মন্তব্য

বিদআতী বা মুবতাদে (যে বিদআত বা দ্বীনে কোন মান্য ও পালনীয় রীতি রচনা করে তা মানে ও পালন করে, তার প্রতি মানুষকে আহবান ও আর্কষণ করে ও তার উপর সম্পূর্ণতা ও বৈরিতা গড়ে সে) ফাসেকও হতে পারে আবার কাফেরও। যেমন বিদআতের প্রকারে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু তার পূর্বে এখানে একটি সতর্কতার বিষয় এই যে, নির্দিষ্ট ভাবে কোন মুসলিমকে চট করে চোখ বন্ধ করে ফাসেক, বিদআতী, কাফের ইত্যাদি বলে আখ্যাত করা উচিত নয়। কারণ এ বিষয়ে শরীয়তে কঠোর ভাবে নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কতা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন : “যে (মুসলিম) ব্যক্তি নিজের (মুসলিম) ভাইকে বলে, ‘এ কাফের ! ’ অর্থাৎ সে প্রকৃত পক্ষে কাফের না হয় তবে সে কথা তার নিজের উপর বর্তায়।” (অর্থাৎ সে নিজেকে কাফের করে।) (মুসলিম)

এর জন্যই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) বলেন, কোন মুসলিমকে কাফের বলার অধিকার কারো নেই, যদিও সে ভুল-ভাস্তি করে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার উপর হজ্জত কায়েম (দলীলাদি দ্বারা কুফরী প্রমাণ) করা হয়েছে এবং স্পষ্ট সুপথ ও মত তার জন্য ব্যক্ত করা হয়েছে। যার ‘ইসলাম’ নিশ্চয়তার সহিত প্রমাণিত হয়েছে তার ‘ইসলাম’ কেবল কারো সন্দেহের কারণে অপগত হবে না। বরং তার ‘ইসলাম’ হজ্জত কায়েম এবং তার সন্দেহ নিরসনের পরই অপসৃত হতে পারে। (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ১২/ ৪৬৬)

কিন্তু যে ব্যক্তি সরল পথ এবং সত্য দ্বারা হতে বহির্ভূত হবে, সে শরীয়ত পরীপন্থী বহু কর্মে আলিঙ্গ হবে। যার অবস্থা হবে ভিন্ন। যেরূপ ঔবেধ কর্মে সে লিপ্ত হবে ঠিক অনুরূপ মন্তব্য তার উপর করা হবে ; স্পষ্ট কুফরী অথবা মুনাফেকী। এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি হেদায়ত ও দ্বীনে হক থেকে অপসৃত হয়, যে আবেদ, আলেম, ফকীহ, যাহেদ, দার্শনিক, অথবা চিকিৎসক সেই সত্য হতে বাহির হয়ে যায় যে সত্যের সহিত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন, আল্লাহ তাঁর রসূল প্রমুখাং যে সব বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছেন তার সবটাকে যে বিশ্বাস ও সৌকার করে না, আল্লাহ ও তদীয় রসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম বলে মানে না ; যেমন যে বিশ্বাস রাখে যে, ‘তার পীর তাকে ঝুঁজী দান করে, সাহায্য করে, বিপদে রক্ষাকরে, অথবা সে তার পীর বা গুরুর ইবাদত (সেজদা, নয়র ইত্যাদি) করে, অথবা তাকে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর সম্যক প্রাধান্য দান করে, বা সামান্য কোন বিষয়ে তাঁর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে, অথবা মনে করে যে, সে এবং তার পীর রসূলের আনুগত্যের মুখাপেক্ষী নয় (তাদের জন্য শরীয়তের অনুসরণ জরুরী নয়) তবে ঐ ধরনের সকল লোকই কাফের-যদি তাদের ঐ বিশ্বাস ও কর্ম প্রকাশ করে তা হলে, নচেৎ গোপন করলে তারা মুনাফেক।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ঐ শ্রেণীর মানুষের আধিক্য হওয়ার কারণ দর্শিয়ে বলেন, ইলম ও ঈমানের প্রতি আহ্বানকারী আলেমের সংখ্যা নগণ্য হওয়ার কারণে ওদের সংখ্যা অধিক বেড়ে গেছে। এ ছাড়া অন্য প্রকার বিদআতী যাদের উপর কোন মন্তব্য করার পূর্বে খুব বিচার-বিবেচনা ও দৃঢ় নিশ্চয়তার প্রয়োজন আছে। কারণ কুফর আকীদায় (বিশ্বাসে) হয় এবং আমনেও। আর উভয়ের জন্য শরীয়তে ভিন্ন-ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।

আবার যে ‘কথা’ কিতাব সুন্নাহ ও ইজমা (সর্ববাদিসম্মতি) তে কুফর তার জন্য সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, যে ব্যক্তি ঐ ‘কথা’ বলবে সে কাফের হয়ে যাবে, যেমন শরয়ী দলিলে তার সাক্ষ্য বহন করে। (কিন্তু নির্দিষ্ট ভাবে কোন ব্যক্তি বিশেষকে তা বলা যাবে না।) ঈমান আল্লাহ ও তদীয় রসূলের নিকট হতে প্রাপ্ত ও

লক্ষ বস্ত। অতএব তা কার আছে এবং কার নেই, সে মন্তব্য কেউ কারো খেয়াল-খুশী বা ধারণা ও অনুমান দিয়ে করতে পারে না।

তাই নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি প্রসঙ্গে বলা যাবে না যে, অমুক ব্যক্তি ঐ ‘কথা’ বলে তাই সে কাফের। কারণ কাউকে কাফের সাব্যস্ত করার জন্য কয়েকটি শর্ত পূর্ণ হতে হবে ; যেমন, ঐ ব্যক্তি ঐ ‘কথা’ বলা আবেধ বা কুফরী তা জানবে, তা সজ্ঞানে বলবে, ঐ ‘কথা’ আবেধ হওয়ার বিষয়ে তার নিকট দলীল পেশকৃত হবে। সে তা মনের ভূলে বলবে না, ঐ কথা আবেধ হওয়ার ব্যাপারে তার মনে কোন সংশয় থাকবে না ইত্যাদি। (ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ৩/৩৫৪)

উপর্যুক্ত শর্তাবলী যদি ঐ ব্যক্তির মাঝে পাওয়া যায় তবে তাকে কাফের বলা যাবে, তার পূর্বে নয়। সুতরাং যদি কেউ বলে যে, সুদ বা মদ হালাল, তবে সে কাফের হবে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা বলা যাবে না। কারণ এমনও হতে পারে যে, ঐ ব্যক্তি কারো নিকট হতে কোন দিন শুনেনি যে, তা হারাম। অথবা শুনেছে কিন্তু মষ্টিক বিকৃতির ফলে সে বলছে। অথবা সে মনে করে যে তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন শক্ত দলীল নেই। অথবা সে সব কিছু জানত, কিন্তু অসাবধানতায় বা মনের ভূলে তা হালাল বলে ফেলেছে অথবা ঐ বিষয়ে তার কোন সন্দেহ ও সংশয় আছে তাই হালাল মনে করেছে ; যেমন কোন ব্যক্তি ব্যাকের সুদকে হালাল মনে করে। কারণ ঐ সুদ কুরআনে নিষিদ্ধ জাহেলিয়াতের সুদ বটে কিনা সে বিষয়ে তার সন্দেহ আছে, অথবা ভাবে যে, কেবল সেই সুদ হারাম যাতে গরীবশোষণ করা হয় কিন্তু যে সুদ সরকারের নিকট হতে নেওয়া হয়, যাতে কোন শোষণ হয়না (?) তা আবেধ নয় অথবা সন্দেহ করে যে এটা বড় ব্যবসায় অংশ গ্রহণ করে তার লভ্যাংশ উপভোগ করা। অথবা দারুল কুফরে সুদ হালাল ইত্যাদি। এ গুলির একটি পাওয়া গেলে ঐ ব্যক্তিকে কাফের বলা যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার এসব অথবা ও অযৌক্তিক সন্দেহ নিরসন হয়েছে এবং তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য দলীল তার সামনে পেশ করা হয়েছে।

অতএব কেউ যদি অজাতে সুদ খায় তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন, হারাম জানা সত্ত্বেও যদি অবহেলা করে খায় তবে সে মহাপাপী (ফাসেক), কোন সন্দেহের কারণে যদি তা হালাল মনে করে তবে সেও মহাপাপী এবং যে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে হারাম জেনেও হালাল ভেবে খায় তবে সে সব কিছু জানার পর যেহেতু আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে অস্তীকার করে হালাল মনে করে তাই সে কাফের হয়ে যায়। তদন্তুরূপ কবর পূজা (কবরকে সিজদা করা, তওয়াফ করা, সেখানে মানত মানা, নয়র-নিয়ায় পেশ করা ইত্যাদি) শির্ক ও কুফর। কিন্তু ‘অমুক মিয়া কবর পূজে তাই সে কাফের’ - তা চট করে বলতে পারি না। কারণ হয় তো সে জানে না যে, কোন কবরের (মৃত মানুষের) নিকট সুখ-সমৃদ্ধি, স্বত্তন বা রুজী চাইলে, বা সিজদা করলে শির্ক বা কুফর হয় অথবা তা জানে, কিন্তু ঐ বিষয়ে তার কাছে কোন সন্দেহ আছে। যদি এসব কিছু তার নিকট

হতে দূর করে দেওয়া হয় এবং তা সত্ত্বেও সে হক ও ন্যায়ের প্রতি প্রত্যার্বতন না করে তবে তাকে কাফের বা মুশরিক বলা হবে, তার পূর্বে নয় ।

মোট কথা, যে বিদআতী সবকিছু জেনে-শুনে, নিঃসন্দেহে কোন এমন কাজ করে (যেমন, কোন সর্ববাদিসম্মত ওয়াজেব বা হারাম অসীকার করা, বা কোন সর্বসম্মত হারামকে হালাল বা তার বিপরীত মনে করা, অথবা আল্লাহ, রসূল বা কুরআন বিষয়ে এমন ধারণা রাখা যা শরীয়ত খণ্ডন করে ইত্যাদি) যাতে কাফের হতে হয়-তবে সে কাফের ।

আর যদি এমন কাজ করে যাতে কেউ কাফের হয়ে যায় না বরং পাপী হয় (যেমন সমসূরে যিক্র করা, কিয়াম করা, নামাযের পর জামাআতী দুআ করা প্রভৃতি) তবে সে শরয়ী আইনে অবাধ্য হওয়ার ফলে কেবল পাপীই হবে, কাফের হবে না । এদের জন্য হেঁদায়েত প্রাপ্তির দুআ করা হবে ।

মানুষ মাত্রেই ভুল করে থাকে। যাঁর সুন্দর আচরণ মন মুক্ত করে, যাঁর চলার পথ ও প্রণালী আহলে সুন্নাহর, যিনি শরয়ী যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী, যাঁর ইলমের সাথে ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠতা প্রসিদ্ধ, যিনি অজ্ঞতা, খেয়াল খুশী ও প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে বহু দূরে, যাঁর কথা ও মতের দলীল কুরআন ও সুন্নাহ তাঁর কোন কোন বিষয়ে দু-একটি ইজতেহাদী ভুল ধর্তব্য নয়। সে ক্রটি তাঁকে তাঁর মর্যাদা হতে চুত করেনা এবং তাঁর কোন মানহানিও ঘটায় না। তিনি যদি জীবিত থাকেন তবে তাঁর সেই ক্রটির উপর শিষ্টতা, ভদ্রতা ও শুদ্ধার সহিত তাঁকে অবহিত ও সর্তক করা উচিত। আপোসের সহাদ বৈঠকে, শুদ্ধাপূর্ণ লেখন বা দুরালাপের মাধ্যমে সৎ ও মঙ্গলে সহায়তা করা ওয়াজেব। যেহেতু দ্বীন তার অনুসারীদের পারম্পরিক হিতোপদেশ ও হিতেষিতার মাধ্যমে পূর্ণ হয়। তাই প্রত্যেক অভিজ্ঞ আলেমের উচিত, তাঁর মান ও মর্যাদার খেয়াল রেখে, দলীলের সহিত, কোন প্রকার ঝুঁতা বা আত্মগর্ব প্রকাশ না করে, প্রজ্ঞা, যুক্তি ও সদুপদেশের সাথে ভুল ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করা। যেমন তাঁরও উচিত, সেই ভুল সীকার করে সঠিক ও সত্য গ্রহণ করতে কোন লজ্জা, দ্বিধা ও সংকোচ না করা। এই রূপে ঐক্য, সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও আল্লাহর জন্য ভাত্তত্ববোধ বজায় থাকবে এবং সকল মুসলিম ভাই ভাই হয়ে উঠবে।

কিন্তু ক্রটি করে যদি আলেম ইহলোক ত্যাগ করে থাকেন, তবে তাঁর জন্য ক্ষমা প্রথিনার দুআ করতে হবে। কারণ আমিয়াগণ ব্যতীত অন্য কেউই নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ ও ক্রটিমুক্ত নয়। তবে তাঁর সেই ভুল সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সর্তক ও সাবধান অবশ্যই করতে হবে। যাতে কেউ তাঁর সেই ভুলের অনুসরণ না করে বসে। তবে ঐ ভুল ও ক্রটি বর্ণনায় যেন ঐ বিগত আলেমের প্রতি কোন অসমীচীন মন্তব্য অথবা তুচ্ছ ধারণা ও মানহানির ইচ্ছা না থাকে।

প্রত্যেক আলেমের উচিত, আহলে সুন্নার আকীদাহ ও বিশ্বাসকে চিরঞ্জীব রাখা, অপরের ইজতেহাদী (খেয়াল-খুশী বা প্রবৃত্তির বশবর্তী নয়, বিদ্বেষ বা ঈর্ষাজনিত নয় এমন) কথা, রায় বা মন্তব্য কে সমীহ ও শুন্দর দৃষ্টিতে দেখা এবং ঐ ধরণের বক্তাকে চোখ বুজে কাফের, বিদআতী ইত্যাদি না বলা। বরং মার্জিত আপোস সমবোতায় আল্লাহর দীনকে এক হয়ে ধারণ করা সকলের মহান কর্তব্য।

বিদআতীর সংসর্গ

মহান আল্লাহ বলেন :

فِإِذَا رَأَيْتَ أَلَّذِينَ يَخْوُضُونَ فِيَنْ تَأْبِيَتَا قَأْغِرِيشَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخْوُضُوا
فِيْ خَيْرِيْتِ غَيْرِيْمٍ وَإِنَّمَا يُنْسِيَتَ الشَّيْطَانُ قَلَّا تَقْعُدُ بَعْدَ الْيَكْرَى
مَعَ الْقَوْمِ الظَّلَّابِيْمِ ﴿١٦﴾

অর্থাৎ “(হে নবী) তুমি যখন দেখ যে, তারা আমার নিদর্শন সমূক্ষে নিরর্থক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি দূরে সরে পড়বে যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে প্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না।” (সুরা আন আম ৬৮)

তিনি অন্যত্রে বলেন :

وَقَدْ نَرَى عَيْنَكُمْ فِي الْكِتْمِ أَنِ إِذَا سَعِيْتُمْ عَاقِبَتِ اللَّهِ يُكْثِرُ بِهَا
وَيُسْتَغْزِلُ بِهَا قَلَّا تَقْعُدُوا مَعْنَمُهُمْ حَتَّىٰ يَخْوُضُوا فِيْ خَيْرِيْتِ غَيْرِيْمٍ إِنَّكُمْ
إِذَا جَنَاحُكُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُتَنَبِّعِينَ وَالْكَافِرِينَ فِيْ جَهَنَّمِ خَوِيْعًا

অর্থাৎ “আর তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি অবর্তীণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর কোন আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হয় তোমরা তাদের সহিত বসো না, নতুবা তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে। কপট ও অবিশ্বাসীদের সকলকেই আল্লাহ জাহান্নামে একত্রিত করবেন।” (সুরা নিসা ১৪০)

প্রবৃত্তির অনুসারী এবং বিদআতীদের সহিত উঠা-বসা করতে তাবেঙ্গনদের বহু ওলামা সাবধান ও নিষেধ করেছেন এবং তা এই আশঙ্কায় যে, হয়তো বা ঐ বিদআতী তার সঙ্গীর উপরেও বিদআতের প্রভাব বিস্তার করে ফেলবে। যেহেতু আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সৎ ও সাধু সার্থী নির্বাচন করতে এবং

অসৎ ও মন্দ সঙ্গী হতে দূরে থাকতে উদ্বৃদ্ধি করেছেন। তিনি ঐ দুই সঙ্গীর উপমা বর্ণনা করে বলেন, “সৎ সঙ্গী সুগন্ধি ব্যবসায়ীর ন্যায় ; যার নিকট হতে সুগন্ধি ক্রয় করা যায় অথবা সে পার্শ্বে উপবেশনকারীকে সুগন্ধি (আতর) উপহার দিয়ে থাকে, অথবা তার নিকট হতে (এমনিই) সুন্দর সুবাস পাওয়া যায় এবং অসৎ সাথী হাপরে ফুঁকারকারী (কামারের) মত। যার পার্শ্বে বসলে অঙ্গারের ছিটায় কাপড় পড়ে যায় অথবা তার নিকট হতে বিকট দুর্গন্ধি (এবং দমবন্ধকারী ধূম্য) নাকে লাগে।” (বুধারী, মুসলিম)

অনুরাপ ভাবে বিদআতীর সাহচর্য গ্রহণ করলে হয়তো বা সে তার বিদআতকে সুন্দর রূপে সুশোভিত করে দ্বীন বলে হৃদয়ে গেথে ফেলবে অথবা তার শরীয়ত পরীপন্থী কথা শুনে বা কাজ দেখে চিন্ত বিদঞ্চি ও ব্যধিগ্রস্ত হবে।

যার জন্য ইমাম হাসান বাসরী বলেন, কোন খেয়াল-খুশীর অনুসারী ব্যক্তি (বিদআতীর) নিকট বসো না, কারণ সে এমন কিছু তোমার অন্তরে ভরে দেবে, যার অনুসরণ করে তুমি ধৰ্ম হয়ে যাবে, অথবা তুমি তার প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করবে যাতে তোমার হৃদয় ব্যাধিগ্রস্ত হবে।

আবু কেলাবাহ বলেন, প্রতিভির অনুসরণকারী (বিদআতী) দের সাথে বসো না এবং তাদের সঙ্গে কোন বিষয়ে ঝগড়া বা বির্তক করো না, কারণ আমার আশঙ্কা হয়ে, তারা তোমাদেরকে তাদের প্রষ্ঠতায় ডুবিয়ে ফেলবে এবং যা তোমরা জানতে তাতে বিভ্রম ও সংশয় সৃষ্টি করবে।

তিনি আরো বলেন, খেয়াল-খুশীর অনুগতরা ভাস্ত ও ভ্রষ্ট এবং নরকই তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল বলে মনে করিঃ। কোন ব্যক্তি বিদআত রচনা করলেই সে তরবারি হালাল করে নেয়।

আইযুব সখতিয়ানী বলেন, ‘বিদআতী যত বেশী ইজতেহাদ করবে তত বেশী আল্লাহ থেকে দূর হতে থাকবে।’ এবং তিনি বিদআতীদেরকে খাওয়ারেজ বলতেন। (ইতিসাম ১/৮৩) ইয়াহয়া বিন কাসীর বলেন, যদি বিদআতীকে কোন রাস্তায় দেখ তবে তুমি তিনি রাস্তা ধরে চলো। (এবং তার সহিত সাক্ষাৎও করো না।)

এতে বুঝা যায় যে, অন্যায়ের সহিত কোন আপোষ নেই। ‘পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয়’ বলে তাদের সহিত কোন বন্ধুত্ব নেই। যে যা করছে করুক, নামে মুসলিম হলেই হবে বলে তার কুফর ও বিদআতের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করে অনবধানতায় এক্য সৃষ্টি করার কথা যুক্তিযুক্ত নয়। তবে পূর্বোক্ত উক্তিগুলির এ অর্থ নয় যে, তাদের নিকট বসে তাদেরকে সত্যের দিকে আহবানও করা হবে না বা সঠিক পথ নির্দেশ করে তাদের ভুল সংশোধিত করা হবে না অথবা তাদের বিআন্তি

ও সন্দেহ নিরসন করার উদ্দেশ্যে কোন ঠাণ্ডা বিতর্ক করা হবে না। বরং তাদের সহিত প্রজ্ঞা, যুক্তি দলীল ও সন্দুপদেশের সাথে আলোচনা করতে হবে এবং তাদেরকে সত্য পথের সঙ্গান দিয়ে ভাস্ত পথ হতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। কারণ তা ‘ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান’ করার অর্থভূক্ত। যা দাওয়াতি কাজের বিভিন্ন মৌলনীতি ও ভিত্তির অন্যতম। যার আদেশ আল্লাহ তাঁর কিতাবে ঘোষণা করেছেন।

তিনি বলেনঃ

وَلَنْكُنْ مِنْكُمْ أَمْةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّلِحُونَ ﴿٤٩﴾

অর্থাৎ “তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎ কার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কার্যে বাধা দান করবে। আর এরাই হবে সফলকাম।” (সূরা আলে ইমরান ১০৮)

সাধারণ ভাবে সমগ্র মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসল্লাম বলেনঃ “তোমাদের মধ্যে কেউ কোন অসৎ কাজ দেখলে তা সুহস্ত দ্বারা অপসারিত করবে, যদি সক্ষম না হয় তবে রসনা দ্বারা, তাতেও যদি সক্ষম না হয় তবে তার অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করবে) এবং এটা সবচেয়ে দুর্বলতম দ্বিমান (এর পরিচায়ক)।”

সুতরাং বিদআতীদের বেদআতে প্রতিবাদ করা, তাদের সহিত প্রতক্রে তাদেরকে পরাম্পর করা এবং তাদেরকে সৎপথের নির্দেশনা দেওয়া যাদের ক্ষমতায় আছে তারা অবশ্যই তাদের মজলিসে বসে সে উদ্দেশ্য সাধন করবে। কিন্তু যাদের সে ক্ষমতা নেই, দিতে গিয়ে হারিয়ে যাওয়ার যাদের তয় আছে এবং তাদের বিভাস্তি ও শোভিত কথায় প্রভাবান্বিত হওয়ার যাদের আশঙ্কা আছে তারা যেন তাদের বৈঠকে না বসে।

বিদআতীর প্রতি সলফের ভূমিকা

সলফে সালেহীনগণ বিদআত ও বিদআতীদের প্রতি অতি কঠোর ছিলেন। বিদআতকে প্রতিহত এবং বিদআতীর প্রতিবাদ করতে তাঁরা কখনো দিখ করতেন না। আব্দুল্লাহ রায়য়াল্লাহ আনহ বলেন, এক সম্প্রদায় আসবে যারা এই সুন্নাহ সমূহকে প্রত্যাখ্যান করবে, অতএব যদি তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর (কোন বাধা না দাও) তবে তারা মহাসংকট উপস্থিত করবে।’

উমর বিন খাত্তাব রায়িয়াল্লাহ আনহু বলেন, ‘রায়ওয়ালাদের থেকে দূরে থেকো। কারণ তারা সুন্মাহর দুশ্মন। হাদীস মুখ্যত করতে অপারগ হয়ে তারা নিজেদের রায় (জ্ঞান) দ্বারা কথা বলে (যীনী বিধান দেয়)। ফলে তারা নিজেরা ভ্রষ্ট হয় এবং অপরদেরকেও ভ্রষ্ট করে।

ইয়াহয্যাহ বিন ইয়ামুর আবদুল্লাহ বিন উমর রায়িয়াল্লাহ আনহুকে বললেন, ‘আমাদের দিকে কিছু লোক বের হয়েছে যারা কুরআন (বেশী বেশী) পাঠ করে এবং ইলম অনুসন্ধানও করে বেড়ায়।’

অতঃপর তাদের আরো অন্যান্য অবস্থা বর্ণনা করে বললেন, ‘তারা ধারণা করে যে, তকদীর বলে কিছু নেই। এবং সমস্ত বিষয় সদ্য উত্সুত, (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা পূর্বে কিছুই তকদীর (ভাগ্য) নির্ধারিত করেন নি এবং কিছু ঘটার পূর্বে তিনি তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত নন।)’ একথা শুনে ইবনে উমর রায়িয়াল্লাহ আনহু তাঁকে বললেন, ‘ওদের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হলে ওদেরকে খবর দাও যে, ওদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং আমার সহিত ওদের কোন সম্পর্ক নেই। আবদুল্লাহ বিন উমর যাঁর হলফ করেন তাঁর শপথ! যদি ওদের কারো উহুদ (পর্বত) সম্পরিমাণ সোনা থাকে এবং তা দান করে তবে আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তা কবুল করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তকদীরের উপর দৈমান এনেছে।’ (মুসলিম)

কাতাদাহ বলেন, ‘কেউ যখন কোন বিদআত রচনা করে তখন (আহলে সুন্মাহর) উচিত তা সকলের সম্মুখে উল্লেখ করা যাতে সকলে তা হতে বাঁচতে পারে।

সলফে সালেহীনগণ এই ভাবে বিদআতের খণ্ডন, প্রতিবাদ ও প্রতিকার করেছেন। তাঁরা কেবল বিভ্রান্ত বিদআতীদের মত ও পথের খণ্ডন করে এবং তাদের বাতিল ও বিভ্রান্তি বর্ণনা করেই তাদের মুকাবিলা করেন নি, বরং সকল মানুষকে তাদের মজলিসে বসতে সতর্ক করেছেন, তাদের সহিত কথা বলতে সাবধান করেছেন, তাদের প্রতি স্থিত মুখ হতে, তাদেরকে সালাম করতে এবং তাঁদের সালামের উত্তর দিতেও বাধা দিয়েছেন। বরং অনেকে তাদের সহিত একত্রে এক পরিবেশে বাস করতেও অপছন্দ ও হশ্মিয়ার করেছেন।

যেমন আবুল জাওয়া বলেন, ‘কোন প্রবৃত্তির পুজারী (বিদআতী) আমার প্রতিবেশী হওয়া অপেক্ষা শুরু ও বানর দল প্রতিবেশী হওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।’

কতক সলফ এমন গ্রাম বা শহরে বসবাস করা পরিত্যাগ করেছেন যেখানে বিদআত প্রসার ও দৃঢ়তা লাভ করেছে এবং প্রতিবেশী এমন গ্রাম বা শহরে বাস করেছেন যা পূর্বাপেক্ষা অধিক সুন্মাহর অনুসারী। যেমন হরাইম বিন আবদুল্লাহ,

হানযালাহ এবং আদী বিন হাতেম প্রভৃতি সলফগণ (বিদআতের শহর) কৃফা ত্যাগ করে কুরকীসিয়ায় গিয়ে বসবাস করেছেন এবং বলেছেন, ‘আমরা এমন শহরে বসবাস করব না যে শহরে ওসমান (রাঃ) কে গালি দেয়া হয়।’

হাসান বলেন, ‘ইচ্ছার পূজারীদের নিকট বসো না, তাদের সহিত কোন তর্ক করো না এবং তাদের নিকট হতে কিছু শ্রবণও করো না।’

মামর বলেন, ইবনে তাউস বসে ছিলেন। ইতিমধ্যে মুতাফিলার একটি লোক তাঁর নিকট এসে অনেক কিছু বলতে লাগল। তা দেখে ইবনে তাউস আঙ্গুল দ্বারা দুই কান বন্ধ করে নিলেন এবং তাঁর ছেলেকেও বললেন, বেটো ! কানে শক্ত করে আঙ্গুল রেখে নাও। ওর কোন কথাই শুনো না।’

ফুয়াইল বিন ইয়ায বলেন, ‘কারো নিকটে কোন ব্যক্তি (ইলম তলবের ব্যাপারে) পরামর্শ নিতে এলে সে যদি কোন বিদআতী (আলেমের) ঠিকানা বলে দেয় তবে নিশ্চয় সে ইসলামকে ধোকা দেয়। বিদআতীদের নিকট যাতায়াত করা হতে সাধান হও। কারণ তারা হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।’

সত্যপক্ষে যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে তার পথপ্রদর্শক, মুরশিদ বা ওস্তাদ মেনে নেয় তার সর্বনাশ অবশ্যভাবী। কারণ,

“কাক যদি কারো পথের হয় রাহবার
চলাইবে সেই পথে যে পথে ভাগাড়।”

তিনি আরো বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর তা’যীম ও সম্মান করে সে যেন ইসলামকে ধ্বংস করার উপর সাহায্য করে, যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর সাক্ষাতে হাসে সে যেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবতীর্ণ শরীয়তকে গুরুত্বহীন মনে করে, যে ব্যক্তি তার স্নেহ-পুতুলী (কন্যার) বিবাহ কোন বিদআতীর সাথে (বা ঘরে) দেয় সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন (পিতা-কন্যার বন্ধন) ছেদন করে এবং যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর জানায়ায অংশ গ্রহণ করে সে আল্লাহর গ্যবে থাকে-যতক্ষণ না সে ফিরে আসো।’ (শারহসসুন্নাহ)

ইব্রাহিম বিন মাইসারাহ বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে তা’যীম বা শুন্দা করে, সে অবশ্যই ইসলাম ধ্বংসে সহায়তা করে।’

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَوْمَ تَبَيَّضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ

অর্থাৎ, “সেদিন কতকগুলো মুখমণ্ডল সাদা (উজ্জ্বল) হবে এবং কতকগুলো মুখমণ্ডল হবে কালো।” (সুরা আলে ইমরান ১০৬) ইবনে আবাস রায়িয়াল্লাহ আনহু এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘সেদিন যাঁদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে তাঁরা আহলে সুন্নাহ অল জামাআহ (হাদীস ও সাহাবার অনুসারীদল) ও ওলামা এবং যাদের মুখমণ্ডল কালো হবে তারা হল, বিদআতী ও ভষ্টের দল। (তফসীর ইবনে কাসীর)

সুফইয়ান সওরী বলেন, ইবলীসের নিকট পাপের চেয়ে বিদআতই অধিকতর পছন্দ। কারণ পাপ হতে তওবার আশা থাকে কিন্তু বিদআত হতে তওবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। (অর্থাৎ তওবার তওফীকই লাভ হয় না। কারণ বিদআতী তার বিদআতকে দ্বীন মনে করে থাকে।)

ইবনে আবী আসেম প্রভৃতি বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, “শয়তান বলে, আমি মানুষকে বিভিন্ন পাপ দ্বারা সর্বনাশ-গ্রস্ত করেছি কিন্তু ওরা আমাকে ‘লাইলাহ ইল্লাল্লাহ’ ও ইস্তেগফার দ্বারা ধ্বংস করেছে। অতঃপর যখন আমি তা লক্ষ্য করলাম তখন ওদের মধ্যে কু-প্রবৃত্তি স্থায়ী করলাম। সুতরাং ওরা পাপ করবে কিন্তু আর ইস্তেগফার করবে না, কারণ তারা ধারণা করবে যে, তারা ভালো কাজই করছে।”

ইমাম ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেন, সাধারণ পাপীর ক্ষতি তার নিজের উপরই বর্তায়, কিন্তু বিদআতীর ক্ষতি ও অনিষ্ট শ্রেণী (বহু মানুষের) উপর ব্যাপক হয়। বিদআতীর ফিতনা হয় মূল দীনে অথচ সাধারণ পাপীর ফিতনা তার প্রবৃত্তিতে হয়। বিদআতী সহজ ও সরল পথের উপর বসে মানুষকে সে পথে ঢেলা হতে বিরত করে, কিন্তু পাপী সেরূপ করে না। বিদআতী আল্লাহর গুণগ্রাম ও তাঁর পরিপূর্ণতায় আঘাত হানে, অথচ পাপী তা করে না। বিদআতী রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম কর্তৃক অনীত শরীয়তের পরিপন্থী হয়, কিন্তু পাপী তা হয় না। বিদআতী মানুষকে আখেরাতের সঠিক পথ হতে বিচুত করে, কিন্তু পাপী নিজেই দ্বীয় পাপের কারণে মৃদুগামী হয়।’ (আল জওয়াবুল কা-ফী)

সুতরাং বিদআতীরা কেবল গোনাহর জন্য গোনাগারই হয় না বরং তারও অধিক কিছু হয় (যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে।) কারণ গোনাগার যখন গোনাহ করে তখন তাতে অপরের জন্য শরীয়ত-বিধায়ীর প্রতিবন্ধিতা করে কোন আর্দ্ধ বা চিরপালনীয় রীতির রূপ দান করে না- যেমন বিদআতী করে থাকে। অতএব তার দুঃক্ষতি সাধারণ দুঃক্ষতির চেয়ে বহু গুণে বড়। আল্লাহ পাক বলেন :

أَمْ لَهُمْ شُرٌّ كَثِيرٌ غَرَّ عَوْنَاهُمْ بِنَ الْقِينِ مَا لَمْ يَأْذِي بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا
كَيْفَةُ النَّصْلِ لَعَبَسَنَ حِيَتْهُمْ قِيلَ الظَّلَابُ لِيَقِنَ لَهُمْ عِذَابُ الْيَمِنِ ﴿٢١﴾

অর্থাৎ, “ওদের কি এমন কৃতকগুলি অংশীদার আছে যারা ওদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন ধর্মের, যার অনুমতি আল্লাহ ওদেরকে দেন নি। কিয়ামতের ঘোষণা না থাকলে ওদের বিষয়ে তো সীমাংসা হয়েই যেত। নিশ্চই সীমা লংঘনকারীদের জন্য মর্মস্তুদ শাস্তি রয়েছে।” (সূরা শূরা ২১)

আবু তালেব বলেন, ‘আমি আবদুল্লাহকে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে (কুরআন সমূক্ষে) কিছু মন্তব্য করতে বিরত থাকে এবং বলে, ‘বলছি না যে, কুরআন মখলুক (সৃষ্টি) নয়।’ এমন ব্যক্তির সাথে যদি রাস্তায় আমার সাক্ষাৎ হয় এবং সে আমাকে সালাম দেয় তবে আমি তার উত্তর দেব কি ?’ তিনি বললেন, ‘তার সালামের উত্তর দিওনা এবং তার সহিত কথাও বলো না। তুমি তাকে সালাম দিলে (বা সালামের উত্তর দিলে লোক তাকে চিনবে কি করে ? আর সেই বা জানবে কি করে যে, তুমি তাকে মন্দ জানছ ? অতএব যদি তুমি তাকে সালাম না দাও তাহলে অপমান স্পষ্ট হয়, জানা যায়, তুমি তাকে মন্দ জেনেছ এবং লোকেও তাকে (বিদআতী বলে) চিনতে পারে।’

বিশেষ করে যে বিদআতে কুফর হয় সেই বিদআতের বিদআতীদের সহিত সলফ ও তার ওলামাদের এই পদক্ষেপ ও ভূমিকা ছিল এবং বর্তমানেও তাই হওয়া দরকার। যেহেতু বিদআত রচনা করে বিদআতীরা প্রকৃত ইসলাম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সেই বিদআত ত্যাগ না করা পর্যন্ত তাদের সহিত কোন প্রকার আপোস স্তুব নয়। ইজতেহাদী আহকাম বা গৌণ বিষয়ে মতান্তর কে দূরে ফেলে আকীদাহ ও মৌলিক বিষয়ে একমত হয়ে একতা স্তুব। (অবশ্য ইসলামের সকল নীতিই মৌলিক, তাতে গৌণ কিছু নেই।) হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী-হাম্বুলী প্রভৃতি ইজতেহাদী পৃথক পৃথক যথাবের মাঝে ঐক্য স্তুব যদি সকলে সহীহ সুন্নাহর অনুসারী হয়। নির্দিষ্ট কোন মাজহাবের (সহীহ সুন্নাহর বিপরীত) তকলীদ করা ওয়াজেব জ্ঞান যদি ত্যাগ করা হয় এবং কেবল আনুগত্য ও অনুসরণ তাৰ করা হয় যাঁর সমস্ত সাহাবা তাবেঙ্গন এবং সকল ইমামগণ করেছেন। আর সামান্য ইজতেহাদী বিষয়ের মতপার্থক্যকে এক ওজর ও অজুহাত বলে মানা যায়। যাতে সকলের নিকট হতে পরম্পর সহিষ্ণুতার সহিত সম্প্রীতি ও আপোস সৃষ্টি করতে সাহায্য পাওয়া যায় এবং সেটাই ওয়াজেব।

কিন্তু যার মতান্তর মৌলিক বিষয়ে কেন্দ্রীভূত তার সহিত ন্যায়ের আপোস সম্ভব নয়। যেহেতু এ মতভেদ সামান্য নয়। এ পার্থক্য হক ও বাতিলের, ঈমান ও কুফরের। আর ঈমান ও কুফরের মাঝে আপোষ আদৌ সম্ভব নয়। যারা হ্যরত আবুবকর, উমার, উসমান, আয়েশা প্রভৃতি সাহাবা (রাঃ) কে গালি দেয় ও কাফের বলে, যারা বলে এ কুরআন সে কুরআন নয়, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের সামনে সিজাদাবন্ত হয়, যারা কবরের নিকট নিজেদের প্রয়োজন ভিক্ষা করে, যারা কবীরা গোনাহগারকে কাফের মনে করে, যারা তাকদীরকে অসীকার করে, যারা আল্লাহর বিভিন্ন সিফাতকে অসীকার করে, যারা সীমিত জ্ঞানের নিকষে সহীহ সুন্নাহ বা হাদীসকে অসীকার করে, যারা মা'রেফাতীর দাবী করে মরমিয়া সেজে শরীয়ত ত্যাগ করে, যারা গায়বী খবর জানার দাবী করে যারা বাউলিয়া হয়ে খানকার মধ্যে ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে ইত্যাদি- এমন মাযহাব ধারীরা নিজেদের মাযহাবে থেকে সালাফীদের সহিত (বাহ্যিক) আপোস করতে চাইলে অথবা কেউ সালিস করতে চাইলে তা সুদূর পরাহত এবং এক সৃপ্ত। আন্তরিক ও বাহ্যিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাদেরকে নিজেদের সুন্নাহ পরিপন্থী ঐ বিশ্বাস সমূহ বর্জন করতে হবে। নচেৎ কোন সালাফী বা আহলে সুন্নাহ ঐ সালিস বা আপোসে রাজি হলে তাকে সালাফিয়াত বা সুন্নিয়াত ত্যাগ করতে হবে। কারণ সলফ ও আহলে সুন্নাহর আকীদাহ, নোংরাকে নোংরা ও মন্দকে মন্দ জানা এবং তার কর্তৃর প্রতি বিদ্বেষ পোষন করা আর খাঁটি তওহিদবাদী হক - পছন্দদের সাথেই অন্তরঙ্গ সম্প্রীতি গড়া এবং তা ওয়াজের। সুতরাং কোন সালাফী ঐ সালিস বা আপোসে সম্মত হলে এবং ঐ জাতীয় দলে শামিল হলে ওতে বাতিল থাকা সত্ত্বেও ওর প্রতি অন্তরঙ্গ সম্প্রীতি রাখবে এবং তা ছাড়া বিরোধী অন্যান্য সবকিছুর প্রতি (সুন্নাহ হলেও) বিদ্বেষ পোষণ করবে এবং ভাববে এটাই সঠিক ও বাকী বেঠিক। অনেক ক্ষেত্রে অন্যায়কে অন্যায় জানা সত্ত্বেও কোন সুর্থে তার প্রতিবাদ করতে নীরব হবে। ফলে ঈমান ও কুফর তার নিকট একাকার হয়ে সালাফিয়াত বা সুন্নিয়াত চুরমার হয়ে যাবে। যেহেতু অন্যায়ের সাথে আপোস করে সালাফিয়াত থাকে না। কারণ হক এক ও অদ্বিতীয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَمَنْذَأَ بِعْدَ الْحَقِّ إِلَّا لِلصَّلَلِ

অর্থাৎ, “হক ও সত্য ত্যাগ করার পর বিভাস্তি ছাড়া আর কি?” (সূরা ইউনস ৩২)

এবং সে হকের পথ সরল। বাকি ডানে বামে সবই বাঁকা পথ। যাতে ভাস্তি ও প্রষ্টতা ছাড়া কিছু নেই। যেমন সরল রেখার আয়াত ও হাদীসে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

অতএব, বলাই বাহুল্য যে, একজন সালাফী বা আহলে সুন্নাহ কোন বিদআতীর দলে একাকার হতে পারে না। (অবশ্য কুর্নীতির ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা) আহলে সুন্নাহ ও সালাফী একতার ডাক দেয়, ইসলামী রাষ্ট্র রচনা করতে চায়, এবং ঐক্য ও মিলনকে

ওয়াজেবও মনে করে। তবে ন্যায় সত্য ও তাওহীদের উপর কিতাব ও সুন্নাহর উপর এবং জামাআহ ও সাহাবার সমবের উপর। কিতাব ও সুন্নাহর ডাকে জামাআহ ও সাহাবার সমবের আওয়াজ ভিল্ল অন্য কোন ঐক্যের প্রতি সালাফীরা আহবান করে না এবং কারো মিথ্যা আহবানে সাড়াও দেয় না। যেহেতু একতা কেবল কিতাব ও সুন্নাহর (শুন্দ ও সঠিক জ্ঞানের) প্লাটফর্মে সম্ভব। শির্ক ও বিদআতের ‘জগাখিচুড়ি’ ময়দানে সম্ভব নয়। কেউ যদি সলফ বা আহলে সুন্নাহর রীতি-নীতি অবলম্বন করে এবং শির্ক ও বিদআত বর্জন করে একতা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তবে আহলে সুন্নাহ তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। নচেৎ একতা প্রতিষ্ঠার জন্য বাতিলকে সীকৃতি দিয়ে কোন সালাফী আপন (কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ তথা সাহাবার) নীতি ও বিশ্বাসের একটি হরফও ছাড়তে বিল্দু মাত্র রাজী নয়।

পক্ষান্তরে ঐ ধরনের আপোস ও ঐক্যের মানুষদেরকে ঐক্যবন্ধ দেখলেও তাদের আপোষে আন্তরিক ও মানসিক মিল থাকে না। ফলে ঐ মরিচিকাকে দূর হতে পানি মনে হলেও নিকটে বা বাস্তবে তা নয়। যে অট্টালিকা কাঁচা-পাকা-ভুয়া প্রভৃতি ইষ্টক দ্বারা নির্মিত তা যে তিষ্ঠিতে পারে না অথবা অদুরেই সদ্যঃপাতী হয় তা সকল স্থপতির জ্ঞান অবশ্যই আছে।

আহলে সুন্নাহ ও সালাফী কি ?

জ্ঞাতব্য বিষয় যে সালাফী বা আহলে সুন্নাহ কোন ময়হাব বা দলের নাম নয়। বরং তা এক নীতি ও পদ্ধতির নাম ; যার ভিত্তি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্থাপন করেছেন এবং তাঁর পর তাঁর সাহাবাবৃন্দ যার ‘অনুসরণ করেছেন আর তাঁরাই সলফ এবং পরবর্তীতে যারা তাঁদের অনুগমন করেন ও ঐ আসল নীতির অনুসরণ করেন তাঁরাও সলফ। আল্লাহ পাক বলেন :

وَالْمُسِيقُونَ الْأَقْلَوْنَ مِنَ الْمُتَجَرِّبِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالْأَنْذِيرِ أَتَيْبُوهُمْ بِإِخْسِنٍ
وَهُنَّ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ وَأَعْدَاهُمْ جَنَاحِيَّتٌ تَحْكِيمًا لِأَنَّهُمْ
خَلِيلِيْدِيْنَ فِيهَا آيَةً ذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيْمُ

অর্থাৎ “মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রাথমিক অগ্রানুসারী এবং যারা (এক বিশ্বাস, এক কথা ও এক আমল ইত্যাদি) সদনষ্ঠানের সাথে তাদের অনুগমন করে আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে (আল্লাহতে) সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য জাল্লাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, এ মহা সাফল্য। (সূরা তওবা ১০০)

অতএব যাঁরা তাঁদের অনুগমন করেন, তাঁদের বুঝে কুরআন ও সুন্নাহ বুঝেন, তাঁদের মতো আল্লাহ ও তদীয় রসূলকে ভালোবাসেন এবং তাঁদের পদ্ধতি মত শরীয়তের আনুগত্য করেন, তাঁরাই সালাফী। যাঁরা দ্বিনী কোন কথা বিশ্বাস করতে বা বলতে অথবা কোন কাজ করতে কোরআন ও সহীহ হাদীসের দলীল খোঁজেন। যাঁরা সহীহ হাদীস ও সলফদের সহীহ উভি অনুসারে কুরআনের ব্যাখ্যা করেন তাঁরাই আহলে সুন্নাহ। সেই সলফে সালেহীনদের জামাআতাই এক মাত্র ইসলামী জামাআত। ইসলামে আর ভিন্ন কোন জামায়াত নেই। এই জামাআতাই পৃথিবীতে সাহায্য প্রাপ্ত এবং আখেরাতে মৃত্তি প্রাপক। অন্যথা কুরআন ও হাদীস তথা সলফের জ্ঞান ব্যতিরেকে যারা মনের খেয়াল বশে অন্য পথ রচনা করে বা বরণ করে ও এই জামাআত ও তার নীতি হতে ভিন্ন নাম ও নীতি নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয় তারাই ধৰ্মস প্রাপক।

পৃথিবীর সর্বশেষ দূরদৰ্শী চিন্তানায়ক মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন : বানী ইসরাইলরা বাহাতৰ ফির্কায় বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উচ্চত তিয়ান্তৰ ফিরকায় বিভক্ত হবে। তমধ্যে বাহাতৰটি ফিরকা জাহান্নামে যাবে এবং একটি মাত্র ফিরকা জাগ্নাতবাসী হবে। ঐ জাগ্নাতী ফিরকা তাদের, যারা আমার ও আমার সাহাবার আদর্শের উপর কায়েম থাকবে। (আবু দাউদ, তিরমিয়ী, মুসনাদে আহমদ)

গীরশেষ হযরত আব্দুল কাদের জীলানী বলেন, জাহান্নাম থেকে নাজাত প্রাপ্ত এই দলটি আহলে সুন্নাহ অল জামাআহর দল। যার একটি মাত্র নাম আছে তা হলো ‘আহলে হাদীসা’ (গুণইয়াতুত তালেবীন)

সুতরাং আহলে সুন্নাহ, হাদীস বা আসার অথবা সালাফীর নীতি এক পূর্ণসংস্থিক ইসলামের নীতি যে নীতির উপরে ছিলেন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম, তাঁর সাহাবাগণ রায়িয়াল্লাহ আনহুম, তাবেঙ্গন ও সকল আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীন-ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, আহমদ বিন হামুল এবং অন্যান্য ইমাম (রাহেমাহমুল্লাহ) গণ। আয়েম্মাগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন বাকেয় একই কথা বলে গেছেন, “সহীহ হাদীসই আমার মযহাব।”

সেই শ্রেষ্ঠ ও চিরস্মৃত নীতি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :-

১ - আলকুরআনে বর্ণিত সমস্ত কথা ও কাজকে নিঃসন্দেহে ও নিঃসংকোচে বিশ্বাস ও ধারণ করা যাতে (যে কুরআনে) পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী কোন প্রকার মিথ্যা ও বাতিল প্রক্ষিপ্ত হয় না ।

২ - সহীহ সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, যা আলকুরআনের ব্যাখ্যাতা ও দ্বিতীয়গুণহী (ঐশীবাণী) যেমন আল্লাহ বলেনঃ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ أَذْكُر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ

অর্থাৎ, “তোমার প্রতি গ্রহ অবতীর্ণ করেছি মানুষের নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তাদেরকে সুস্পষ্ট ভাবে বোঝাবার জন্য ...।” (সূরা নাহল ৪৮)

অন্যত্রে বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْقَوْمِ ② إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ مِّنْهُمْ ②

অর্থাৎ, “এবং সে (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, তা তো ওহীই, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।” (সূরা নাজম ৩-৪)

৩ - আল্লাহকে একমাত্র প্রতিগালক, সৃষ্টিকর্তা, বিধায়ক এবং একমাত্র উপাস্য ও মাদুদ রূপে বিশ্বাস করা। তিনি ছাড়া আর কেউই (সত্য) উপাস্য নেই। গুণ্ঠ ও প্রকাশ্য বিশ্বাস্য, কথনীয় এবং করণীয় যাবতীয় ইবাদাত কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে তাঁকেই নিবেদন করা।

৪ - তাঁর সমন্বয় আসমা ও সিফাত (নাম ও গুণাবলী) এর উপর সেই মত দ্বিমান রাখা যে মত তিনি তাঁর কিতাবে নিজেকে বর্ণিত ও ব্যক্ত করেছেন এবং যে মত তাঁর রংসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর (সহীহ) সুন্নাতে বর্ণনা দিয়েছেন। তার স্পষ্ট অর্থ ও সহজার্থ গ্রহণ করা এবং অর্থে কোন প্রকার বিকৃতি, হেরফের বা দূর ব্যাখ্যার অনুপ্রবেশ না ঘটানো। অথবা সেই শব্দ সমূহকে অর্থহীন কিংবা আল্লাহ জাল্লাহ তাআলার ঐ অর্থবহুগুণহীন না মনে করা এবং ঐ অর্থের বা গুনের কোন প্রকার উপযামা, উদাহরণ, সাদৃশ্য বা স্বীকৃতা বর্ণণা না করা বরং তা কেমন, কি প্রকার, কি রূপ ইত্যাদি প্রশ্নও মনে না আনা। আল্লাহ বলেন :

أَيْنَ كَعْبَلَهُ شَيْءٌ وَهُوَ أَلْتَعَبُ بِالْعَصْبَرِ

অর্থাৎ, “কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদৃষ্টা।”(সূরা শূরা ১১)

৫ - আল্লাহ পাক যা অবতীর্ণ করেছেন তা নিজেদের এবং রাষ্ট্রের (জীবন) সংবিধান করা, এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদর্শ ও বিধান দ্বারা সকল সমস্যার ও বিবাদ-বিস্মৃদের সমাধান ও বিচার-মীরাংসা করা। যেহেতু

আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَهْكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ

بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْ فَقْتَ أَنْتَسِهِمْ حَرْجًا مِّمَّا قَضَيْتَ

وَنِسْلَنُوا تَشْلِيمًا



অর্থাৎ, “কিন্তু না, তোমার প্রতি পালকের শপথ ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার তোমার উপর অর্পণ করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সমূক্ষে তাদের মনে কোন বিধা না থাকে এবং সর্বান্তরে তা মনে নেয়। (সূরা নিসা ৬৫)

৬ - সৎকার্যের আদেশ এবং অসৎ কার্যে বাধা দান করা এবং সৎপথের প্রতি মানুষকে আহবান করা। আল্লাহ পাক বলেন :

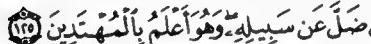
فُلْهَذِيهِ سَبِيلٌ أَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمِنْ أَتَبَتَنِي وَشَبَخْنَ
اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ



অর্থাৎ, “বল, এটিই আমার পথ ; আমি এবং আমার অনুসারীগণ সজ্ঞানে আল্লাহর প্রতি (মানুষকে) আহবান করি, আল্লাহ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহর অংশী স্বাপন করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।” (সূরা ইউসুফ ১০৮)

তিনি অন্যত্রে বলেন :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحَكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْمُخْسِنَةِ وَحَدِّلْهُمْ بِالْقِيَ هَيْ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ



অর্থাৎ, “তুমি (মানুষকে) প্রজ্ঞা (যুক্তি) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর এবং ওদের সাথে সন্তুবে আলোচনা কর। অবশ্যই তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে যে বিপথগামী হয়, সে সমূক্ষে সবিশেষ অবহিত এবং যারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ জানেন।” (সূরা নাহল ১২৫)

অতএব সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যে নিবেধ এবং আল্লাহর পথে আহবান (তবজীগ) এই দুটি আয়াতের ভিত্তিতে করা। প্রথমতঃ ইলম বা শরয়ী জ্ঞান ও দ্বিতীয়তঃ হিকমত বা প্রজ্ঞা বা যুক্তি ও দুরদর্শতা। প্রত্যেক মুসলিম তার সম্মূল ও সামর্থান্যায়ী নিজের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ও কর্মসূচির ভিতরে এই দাওয়াত কার্যে অংশ গ্রহণ করবে। আর আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতীত দায়িত্বভার অর্পণ করেন না। যেমন তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন : “তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন মন্দ কাজ দেখবে সে তার হাতের দ্বারা অপসারণ (বাধা দান) করবে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে তার জিভের দ্বারা, যদি তাতেও সক্ষম না হয় তবে তার অন্তর দ্বারা (ঘৃণা জানবে) এবং তা দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক। (মুসলিম)

সুতরাং হস্ত দ্বারা বাধা দেওয়া শাসন কর্তৃপক্ষের কর্তব্য এবং অনুরূপ ভাবে পরিবারের জন্য তার অভিভাবকের কাজ। মুখের দ্বারা বাধা দেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের কাজ। যদি কথার সাহায্যে-ও গর্হিত কর্ম দূর করতে (ফিনা ইত্যাদির ভয়ে) সক্ষম না হয় তবে তার উচিত, অন্তর থেকে ঐ মন্দকে ঘৃণা করা নচেৎ ঈমান হারিয়ে যায়।

৭ - দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং মানুষকে মানুষ অথবা জড়ের ইবাদত করা হতে রক্ষা করে একমাত্র মানুষ ও জড়ের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক একক উপাস্যের ইবাদত করতে পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে সর্বপ্রকার জিহাদ করা।

৮ - কারো প্রতি বন্ধুত্ব বা বিদ্রেষ কিতাব ও সুন্নাহর নির্দেশমত করা (কোন দল বা ব্যক্তিত্বের খাতিরে নয়)। আহলে সুন্নাহ বা হাদীসকে ভালোবাসা এবং আহলে বিদআহকে ঘৃণা করা।

৯ - প্রথমে সংশোধন ও তরবিয়তের অতঃপর সংগঠন ও রচনার পথ অনুসরণ করা।

১০ - কুরআন ও সহীহ হাদীসের প্রতিকূল কোনও বক্ত্বার ব্যক্তিপূজা না করা। এই দুই এর উপর কোন ইমাম, আলেম বা চিন্তাবিদের কথাকে প্রাধান্য না দেওয়া, এ দুয়ের পরীপন্থী সকল মত ও সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র এ দুয়েরই অনুসরণ করা।

১১ - নেতা, আধীর বা রাজার আনুগত্য করা-যদি তারা কোন পাপ কার্য্যের আদেশ না দেয় এবং স্পষ্ট সপ্রমাণ কুফরীর প্রকাশ ছাড়া তাদের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা না করা।

১২ - সংখ্যায় কম হলেই পথ চলতে আতঙ্ক ও ভয় না পাওয়া। কেবল মাত্র হক ও দলীলের সাথে সম্মত হওয়া যদিও বা সারা দুনিয়া তাদের বিরোধী হয়।

১৩ - দ্বীনের যাবতীয় আদর্শ ও শিক্ষায়, ব্যবহার ও আচরণে পরম্পর সহানুভূতিশীল হওয়া। সকলে মিলে যেন একটি দেহ; যার কোন একটি অঙ্গ ব্যথিত হলে জাগরণে ও জুরে সারা দেহ সমব্যথী হয়। যেমন রসূল সাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চরিত্র ছিল আলকুরআন, তদনুরূপ ছিলেন তাঁর সাহাবৃন্দ যাঁরা আমাদের আদর্শ ও সলফ।

বিদআতের প্রথম বিকাশ

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) বলেন, ‘ইলম ও ইবাদত বিষয়ক (প্রায়) সর্বপুরুষের বিদআত খুলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফত কালের শেষের দিকেই প্রকাশ পায়। যেমন এ বিষয়ে সতর্ক করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লাম বলেছিলেনঃ ‘যে আমার পর জীবিত থাকবে সে বহু মতানৈক্য দেখতে পাবে, সুতোরাং তোমরা আমার ও আমার পর খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ (আদর্শ) কে আঁকড়ে ধরো।’ (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ১০/৩৫৪)

সর্বপ্রথম কদরের (তাকদীর বলে কিছু নেই এই বিশ্বাসের) বিদআত বিকাশ লাভ করে, অতঃপর ‘ইরজা’ (আমল সৈমানে শায়িল নয় -এই বিশ্বাস), ‘তাশাইয়ু’ (হ্যরত আলী প্রথম খলিফা হওয়ার যোগ্য ও অধিকারী এই ধারণার উপর ঘটিত) বিদআত এবং খাওয়ারেজ (যারা বলে কাবীরাহ গুনাহকারী কাফের এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী তাদের) বিদআত প্রকাশ পায়। এ সমস্ত বিদআত গুলি প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে সাহাবাদের বর্তমানেই ঘটে। যাতে তাঁরা অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন এবং উচিত মত সে সবের প্রতিবাদ ও খণ্ডনও করেছিলেন। বরং হ্যরত আলী (রাঃ) খাওয়ারেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিলেন অতঃপর মুতাফিলা আকলানীদের (যারা আকল বা জ্ঞান দ্বারা শরীয়ত বুঝে তাদের) বিদআত দেখা দেয় এবং মুসলিমদের মাঝে বড় বিধ্বনি ও ফিতনার সৃষ্টি হয়। বিভিন্নমুখী মতানৈক্য, কলহ-বিবাদ ও খেয়াল-খুশীর পূজ্জা বাঢ়তে থাকে। তাসাউবুফ (সুফীবাদ) ও কবর পূজার বা মায়ারের বিদআত প্রকাশ হয় ইসলামী সূর্য়গুণের পর এবং সেই ভাবে পর পর যুগ অতিরিক্ত হওয়ার সাথে সাথে আরো অন্যান্য রকমারি বিদআতের প্রাদুর্ভাব ঘটে। প্রধান প্রধান বিদআত দেখা দেয় বসরা, কুফা ও শাম থেকে, যা পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে।

বিদআত সৃষ্টির কারণ

ইসলাম পূর্ণসঙ্গ ধর্ম। যা পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এবং সর্বাঙ্গসুন্দর কানুন ও সংবিধান রূপে মানুষের নিকট আগত। যার না কিছু পরিত্যাজ্য এবং না তাতে কোন অতিরিক্ত সংযোজন ও অতিরঞ্জন গ্রহণযোগ্য। যার মূল উৎস কিতাব ও সুন্নাহ। যা সুন্দরভাবে ধারণ করলে কোন বিদআতে বা ভ্রষ্টতায় পড়ার কোন আশঙ্কাই অবশিষ্ট থাকে না। অন্যথা এই মূল উৎস থেকে দূরে সরতে থাকলেই বিদআতে পড়ার আশঙ্কা থাকে। এই মূল উৎস থেকে অপসারিত হয়ে বিভিন্ন বিদআত সৃষ্টির বিভিন্ন কারণ নিম্নরূপ :

১ - অজ্ঞতা

দ্বীন বিষয়ে যথার্থ পড়াশুনা না করা বা না জানা, ধর্মের আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা, সঠিক আরবী ভাষাজ্ঞান না থাকা প্রভৃতি। এসব বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকলে অবশ্যই মানুষ বিদআত ও ভ্রষ্টতায় পড়তে বাধ্য। যেমন পথ না চিনলে অবশ্যই মানুষ ভ্রান্ত পথে বিপথগামী হতে বাধ্য হয়।

শরীয়ত মুসলিমকে জ্ঞান শিক্ষার উপর ফরয রূপে উদ্বৃক্ত করে। অজ্ঞানে কোন কথা আন্দাজে বলতে সাবধান করে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَلْ إِنَّمَا حَرَمَ رَبِّ الْقَوْمَ حِلَّ مَا طَعَّمَ مِنْهَا وَمَا يَطْعَنُ وَالْأَيْمَمُ وَالْبَيْقَى بِعَيْنِ
الْحَقِّ وَأَنْ شَفَرٌ كَوَافِرُ مَا لَمْ يَنْتَزِلْ بِهِ شَلَطَتْنَا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا
لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾

অর্থাৎ, “বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ (হারাম) করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশীলতা আর পাপাচারকে ও অসঙ্গত বিরোধিতাকে এবং কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করাকে-যার কোন দলীল তিনি অবতীর্ণ করেন নি এবং আল্লাহর উপর এমন কিছু বলাকে যে সমৃক্ষে তামাদের কোন জ্ঞান নেই।” (সুরা আরাফ ৩৩)

তিনি আরো বলেন :

وَلَا تَنْقِضْ مَا أَئْتَتْ لَكَ يَهِيءَ جَلَمْ إِنْ آسْمَعَ وَالْبَصَرَ وَآنْفُوَادَ كُلُّهُ أَوْ تَبْلِغَ
عَكَانَ عَنْهُ مَسْتَوْلًا ﴿١٣﴾

অর্থাৎ, “যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না, নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হস্তয় - ওদের প্রত্যেকের বিষয়ে কৈফিয়ত তলব করা হবে।” (সুরা ইসরার ৩৬)

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন : “আল্লাহ বান্দাদের নিকট থেকে ইলম ছিনিয়ে নেওয়ার মত তুলে নেবেন না। বরং ওলামা তুলে নিয়ে ইলম তুলে নেবেন। এমতাবস্থায় যখন কোন আলেম অবশিষ্ট রাখবেন না তখন মানুষ মুর্খদেরকে গুরু (ও নেতা) রূপে বরণ করবে। ফলে তারা জিজ্ঞাসিত হলে বিনা ইলমে ফতোয়া দেবে, যাতে তারা নিজে ভ্রষ্ট হবে এবং অপরকে ভ্রষ্ট করবে।” (বুখারী ও মুসলিম ২৬৭৩)

তিনি আরো বলেন, “আমার পূর্বে কোন উম্মতের মাঝে আল্লাহ যে কোনই নবী পাঠিয়েছেন তাঁর জন্যই তার উম্মতের মধ্য হতে সাহায্যকারী ও সহচরবর্গ

ছিল ; যারা তাঁর আদর্শের অনুসারী ছিল। অতঃপর তাদের পর এমন উত্তরসুরিদের জন্ম হয় যারা যা কাজে করে না তা মুখে বলে এবং যা করতে তারা আদিষ্ট নয় তাই করে। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন লোকদের বিরুদ্ধে নিজ হাত দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ অন্তর দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন এবং এর পশ্চাতে এক সরিষাদানা পরিমাণে ইমান নেই।” (মুসলিম)

সুতরাং জ্ঞান এমন আলোকবর্তিকা যার দ্বারা মুসলিম আখেরাতের পথ সুস্পষ্ট রূপে দেখতে পায় এবং কর্তব্যাকর্তব্য ঐ আলোকে প্রকটিত হয়। ফলে নিজে সে ভ্রষ্ট ও ধ্বংস হয় না এবং অপরকেও ভ্রষ্ট ও ধ্বংস করে না। পক্ষান্তরে জাহেল এক অঙ্গ। যে নিজে পথের দিশা পায় না, সুতরাং অপরকে তো পথের সঞ্চান বলতেই পারে না। (কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর) এমন অঙ্গ নিজে বিদআতী হয় এবং ভুল ফতোয়া দিয়ে, জাল ও যফীফ হাদীসকে ভিত্তি করে আহকাম রচনা করে ও তা প্রচার করে অপরকেও বিদআতী বানায়। অনেকে কিসসা-কাহিনী এবং সৃপ্তবৃত্তান্ত দ্বারা আমল করে এবং তাই দিয়ে দাওয়াতের কাজ করে। এরা এমন কাঠুরে যারা রাতের অঙ্গকারে কাঠ কুড়ায় এবং সাপও কুড়ায়। ফলে নিজেদের ধ্বংস ডাকে এবং যারা তাদের কাঠ ক্রয় করে তাদের সর্বনাশ আনে। প্রয়োজন সত্ত্বেও আলো জরুরী মনে করে না। বরং ইলম ও ওলামার নামে নাক সিঁটকায়। যেহেতু ওলামারা ওদের মত কাঠুরে নয় তাই।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, একদা আমরা সফরে বের হলাম। আমাদের মধ্যে একব্যক্তির মাথায় পাথরের আঘাত লেগে ক্ষত ছিল। পরে তার সৃপ্তদোষ হল। লোকটি (পবিত্রতা সম্পর্কে) তার সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করল, ‘আমার জন্য তায়াম্বুমের অনুমতি আছে কি?’ তারা বলল, ‘না, তোমার জন্য সে অনুমতি নেই কারণ তুমি পানি ব্যবহার করতে সক্ষম।’ (এই ফতোয়া শুনে) লোকটি গোসল করল। (এবং ক্ষতস্থানে পানি পৌঁছে ক্ষত বর্ধিত হলে) তাতে সে মারা গেল। অতঃপর যখন আমরা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসল্লামের নিকট ফিরে এলাম তখন ঐ লোকটির কথা জানালাম। তখন ঘটনা শুনে তিনি বললেন, “ওরা ওকে হত্যা করেছে, আল্লাহ ওদেরকে ধ্বংস করেন, কেন তারা জিজ্ঞাসা করেনি, যদি তারা জানত না ? মুর্খতা রোগের নিরাময় তো প্রশংসন ও জিজ্ঞাসাই। ওর জন্য তো তায়াম্বুমই যথেষ্ট ছিল।” (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মৃঃ আহমদ ১/৩৩০)

এতো ইহকালের ধ্বংসের কথা। কিন্তু ঐ গদ্দিনশীন জাহেল মুরশিদরা তো মানুষের পরকাল মন্দ করে এবং চিরস্থায়ী সর্বনাশের মুখে ঠেলে দেয়। কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানকে কিতাবী জ্ঞান বা জাহেরী ইলম বলে অপদার্থ জ্ঞান করে এবং ওদের কল্পিত বাতেনী বা গুপ্ত কল্পী জ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান বলে গুপ্ত ভাবেই কেবল

নিজেদের ভক্তদের মাঝে প্রচার করে। ফলে ঐ জ্ঞানের কৃষ্ণতমসে নিজেদেরকে ও তার সাথে মুরীদদেরকেও সর্বনাশগ্রস্ত করে। পথের দিশা দিতে গিয়ে হতের দিশা দান করে থাকে।

পক্ষান্তরে অনেকে মনে করে যে, আমলটাই আসল। কোন আলেমের নিকট অথবা সময় নষ্ট করে ইলম শিক্ষার কোন লাভ নেই কিন্তু তারা জানে না যে, ইলম শিক্ষা করাও এক বড় আমল। এবং বিনা ইলমে আমল সম্ভবই নয়। যাতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই অধিক হয়ে থাকে। ইলম মুমিনের অন্ত ও ঈমানের জ্যোতি, তার চিরশক্ত শয়তান এই অন্ত হতে দূর এবং এই জ্যোতিকে নির্বাপিত করতে সফল হলে তাকে ধ্বংস ও ভষ্ট করা খুবই সহজ হয়। অঙ্ককারে পথ ভুল হয়। বিদআত বেড়ে চলে।

‘আমপারা পড়ে হামবড়া করে’ আর দুপাতা উর্দু পড়ে ওশাদজী সেজে অথবা ইয়াম রূপে প্রত্যেক মহল্লায় ‘খাস-খাস’ ফতোয়া চলে। কেউবা মকসুদুল মুমেনীন বা বেহেশতী যেওর কে বুখারী মুসলিমের দর্জা দিয়ে চোখ বুজে আমল করে। কেউবা নিম মৌলভী অথবা শুন মৌলভীর কথায় ঈমানদার ও পরহেয়গার সাজে। কিতাব ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞানী আলেম ও মুফতিদের কোন প্রয়োজনই বোধ হয় না। ফলে ঐ সমাজের অবস্থা এই যে, কিতাব ও সুন্নাহর কোন আলেম সঠিক পথ দেখাবার চেষ্টা করলে ‘কাফের’ ফতোয়া দিয়ে গদিনশীনরা নিজেদের গদি যাবার ভয়ে নিজ ভক্তদের কানে তালা ঝুলিয়ে দেয়, অথবা ‘নতুন হাদীস’ বলে নাক সিঁটকে দেয় ফলে সংক্ষার ও সংশোধন কঠিন হয়ে পড়ে। বিদআতের অঙ্ককার আরো ঘনীভূত হতে থাকে।

২ - প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীর অনুসরণ

বিদআত জন্মের এক কারণ প্রবৃত্তি পূজা। কোনও কর্মকে উত্তম মনে করা হয়, অতঃপর শয়তান সেই কর্মকে অধিক সুন্দর ও সুশোভিত রূপে তার মনে প্রবেশ করিয়ে দেয়। মন তা পছন্দ ও বরণ করে। কখনো বা অভ্যাসগত ভাবে ঐ কর্মকেই ধর্ম বলে পালন করে। যখন কারো সর্তকবাণীও গ্রাহ্য হয় না।

বিদআত ঐ প্রবৃত্তিরই বুনা জাল। যে প্রবৃত্তির কাছে কিতাব ও সুন্নাহর ততটা বা কিছুটাও মান নেই। বস্তুতঃ যারাই কিতাব ও সুন্নাহর পথ ছেড়ে অন্য পথে চলতে চায় তারাই প্রবৃত্তির পূজা করে এবং নিজ মনের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে।
আলাহ তাআলা বলেন :

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَبَيَّنُ أَهْوَاءُهُمْ وَمَنْ أَصْلَى مِنْ آيَةَ
هَوَانَةُ بِعَيْنِ هُدَى مِنْ أَنَّ اللَّهَ إِلَيْهِ لَا جَدِيدٍ أَلَّوْمَ الظَّالِمِينَ ⑩

অর্থাৎ, “অতঃপর ওরা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয় তাহলে জানবে যে, ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ বিনা যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক বিভাস্ত আর কে?” (সূরা কাসাস ৫০)

অন্যত্রে বলেন :

إِنْ يَتَبَيَّنُونَ إِلَّا لِأَطْفَلٍ وَمَا تَفْوَى
الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مَنْ دَبَّاهُمْ الْمُهَدَّدُونَ ﴿٢٧﴾

অর্থাৎ, “ওরা তো কেবল অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে অথচ ওদের নিকট ওদের প্রতিপালকের তরফ হতে পথনির্দেশ এসেছে।” (সূরা নাজাম ২৩)

তিনি আরো বলেন,

أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَأْكُلُ إِلَّا فِيمَا هَوَى وَأَخْرَجَ اللَّهُ عَلَىٰ
عَلِيهِ وَخَلَقَهُ عَلَىٰ سَمَوَاتِهِ وَقَالَ لَهُ وَجَّهْ كُلَّ عَلَىٰ بَشَرٍ
غَفُورٌ فَمَنْ قَاتَبَهُ مِنْ بَعْدِ أَلْلَهِ فَأَفْلَأَ تَذَكْرُونَ ﴿٢٨﴾

অর্থাৎ, “তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজের উপাস্য করে নিয়েছে? আল্লাহ (তার প্রষ্ঠাটা) জেনেই তাকে বিভাস করেছেন, তার কর্ণ ও হাদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহ মানুষকে বিভাস করার পর কে তাকে পথ নির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?” (সূরা জাসিয়া ২৩)

সুতরাং প্রবৃত্তি পূজা এমন এক বিপজ্জনক হৃদয়োগ যার কারণে পূজারী মানুষ বিভাস ও কুটিলতায় পড়ে সরল পথ থেকে সুদূরে অপসৃত হয়। এমন বক্রপথ অবলম্বন করে যে, সঠিক পথ-নির্দেশ সত্ত্বেও সত্য পথে প্রত্যার্বতন করতে সম্মত হয় না। পর্বতসম দলীল তার কাছে পেশ করলেও তা অগ্রাহ্য করে নিজের ঘরেই দৃঢ়ভাবে নির্বিচল থাকে। যেহেতু ঐ খেয়াল তার মনে এমন ভাবে বদ্ধমূল হয় যে, ন্যায় শুনতে কর্ণ বধির এবং সরল ও সত্য পথ দেখতে চক্ষু অঙ্গ হয়ে যায়। কখনো বা কিতাব ও সুন্নাহ থেকেই এমন দলীল বক্রতার সহিত বের করে যা তার প্রবৃত্তি ও মতের বাহ্যতাঃ অনুকূল মনে হয়। কখনো বা একটি মাত্র আয়াত বা হাদীস অথবা তার কোন একাংশ ধরে তা নিজের মতের উপর দলীল রূপে পেশ করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। কিন্তু অন্যান্য আয়াত, হাদীস বা তার পূর্ণাংশের প্রতি ভ্রক্ষেপ করে না। এমন গোঁয়ার ও ভুষ্টলোকের সৃষ্টি বিদআত সবচেয়ে অধিক মারাত্মক।

৩ - সন্দিহান উক্তির উপর নির্ভরতা

বিদআত সৃষ্টির এক কারণ সন্দিহান ও রূপক (দুর্বোধ্য) আয়াত বা হাদীসের মনগড়া অর্থ ও ব্যাখ্যা করা। যাতে ব্যাখ্যাতা অসঙ্গত তাৎপর্য করে আসল উক্তির পরিবর্তন ঘটায় এবং এক উক্তির সহিত অন্য উক্তির পরম্পর বিরোধিতা ব্যক্ত করে। কিতাবের কিছু অংশের উপর সমান আনে এবং কিছু অংশকে অস্তীকার করে। এই সমস্ত রূপক আয়াতের মনগড়া ইলম মনে সঞ্চার করে বাতেমী ইলমের খাজানা পেয়েছে বলে দাবী করে। অর্থ এরাই হচ্ছে বক্রতা ও ভ্রষ্টতার ভাঙ্গার।

হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই আয়াত তেলাঅত করলেনঃ

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ مَا يَنْهَا مُخْكِمٌ هُنْ أُمُّ الْكِتَابِ
 وَأَخْرُوٌ مُّتَقْدِمٌ فَإِنَّمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَيْحَانَ فَيَقْرَئُونَ مَا تَشَبَّهَ مِنْهُ
 آتِيَفَاهُ الْفَيْضُ وَآتِيَفَاهُ تَأْوِيلُهُ ۝ وَمَا يَعْلَمُ ثَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسُولُونَ فِي
 الْجَلَمِ يَقُولُونَ عَامِنَا بِهِ ۝ كُلُّ مَنْ عَنِيدٌ رَّيْثَا ۝ وَمَا يَدْكُنُ إِلَّا أُولَوَالْأَلْبَابِ

অর্থাৎ, “তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার আয়াত সুস্পষ্ট দ্যুঃহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ ; আর অন্যগুলি রূপক। যাদের মনে বক্রতা আছে তারা ফিতনা (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না এবং যারা সুবিজ্ঞ তারা বলে, ‘আমরা এ বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত’। বস্তুতঃ বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে।” (সুরা আলে ইমরান ৭)

অতঃপর তিনি (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন, “সুতরাং যাদেরকে রূপক আয়াতের অনুসরণ করতে দেখবে আল্লাহ তাদেরকেই উদ্দেশ্য করেছেন, তাই তাদের থেকে সাবধান থেকো। (বুখারী ও মুসলিম)

রূপক আয়াত নিয়ে বিদ্যা জাহিরকারী (ভেদ প্রকাশকারী) ও বিভিন্ন সংশয় সৃষ্টিকারী এক ব্যক্তিকে হ্যরত উমর (রাঃ) প্রচণ্ড ভাবে প্রহার করে এমন শায়েস্তা করেছিলেন যে, অতঃপর আর কোন দিন তার মনে কোন সন্দেহের উদ্বেক হয়নি। এমন লোক যে এ যুগে কম তা নয়। কিন্তু সে উমর আর নেই। তাই তো এমন কেরামতবাজদের বিদআতে ভ্রষ্টতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে মুসলিম সমাজ অধঃপতনের শিকার হয়েছে।

সংশয় এক এমন ভয়ানক ব্যাধি যে, ঐ ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের নিকট আসল ও প্রকৃত বিষয় চাপা পড়ে, হক ও বাতিলের মাঝে তালগোল খেয়ে যায়। কখনো বা এমনও হয় যে, ঐ মানুষ ইসলামী গঙ্গি থেকে অজান্তে বের হয়ে যায়। আবার এই ব্যাধির মাধ্যমেই ইসলাম-দুশমনরা মুসলিমদের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে দুর্বল স্টামানের মানুষদের মনে বিপজ্জনক স্টামান-ধৰ্বসী জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটায়। ফলে মুসলিম নিজ স্টামানে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করে এবং এক সময় স্টামান-হারা হয়ে যায়।

তাইতো এসব বিষয়ে মুসলিমকে বড় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। বিশেষ করে যে সব বিষয়ে অধিক সন্দেহ জাগার সম্ভাবনা থাকে (যেমন তকদীর, সিফাত প্রভৃতি) সে সব বিষয়ে স্টামান পাকা ও মজবুত করা উচিত। প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহর সিফাত (গুণ) সম্মতি আয়াত সম্মতের কোনটাই রূপক (মুতাশা-বিহ) নয়। কেন না তাঁর সিফাতের অর্থ আমাদের সুম্পষ্ট জানা, অবশ্য তার রকমত্ত ও সূরাপ সকলের কাছে অজানা। সূতরাং সে বিষয়ে কারো কোন সংশয় হওয়ার কথা নয়।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলতেন, ‘আল্লাহর উপর স্টামান এনেছি এবং তাঁর নিকট হতে আগত সকল বিষয়ের উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যেরই অনুবর্তী হয়ে স্টামান এনেছি। রসূলের উপর স্টামান এনেছি এবং তাঁর নিকট হতে আগত সকল বিষয়ের উপর রসূলের উদ্দেশ্যেরই অনুবর্তী হয়ে স্টামান এনেছি।’ (যমুত তা'বীল)

ইমাম মালেক (রঃ) আল্লাহর আরশে থাকার কেমনত্ত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে বলেছিলেন, ‘আরশে থাকা বিদিত, তার কেমনত্ত অবিদিত এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন (কৈফিয়ত) করা বিদআত।’

৪ — কেবলমাত্রে জ্ঞানের উপর ভরসা করা

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে শ্রেষ্ঠতম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সৃষ্টিজগতে অনেকের চেয়ে মানুষকেই অধিকতম শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান প্রদান করেছেন। মানুষের দেহ সৃষ্টি-বিচিত্রে তাঁর বিশ্বাকর শক্তি এবং সীমাহীন প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি ঘটেছে। মানুষের দেহ-বিচিত্রে মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি আল্লাহর এক মহাদান। যার দ্বারা মানুষ ভালোকে মন্দ হতে এবং হককে বাতিল হতে পার্থক্য করতে পারে। শরীয়তের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ জ্ঞানকে কাজে লাগাতে বলা হয়েছে। এই জ্ঞান ও বিবেক যাতে বিনষ্ট না হয়ে যায় তার বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কিন্তু মানুষ এই অমূল্য জ্ঞান সম্পদকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ও অবহেলার শিকার হয়েছে। কিছু মানুষ আছে যারা কোন বিষয়ে জ্ঞান খাটাইতে চায় না, বরং অঙ্গভাবেই সবকিছু বিশ্বাস করে ও মেনে নেয়। এমনকি যেখানে শরীয়ত আদেশ করেছে সেখানেও জ্ঞানের ব্যবহার করতে কার্পণ্য বা আলস্য করে।

আল্লাহ পাক বলেন :

سُرِّيهُمْ خَاتِمَنَا فِي الْأَقْوَىٰ وَفِي أَنْتِهِمْ حَتَّىٰ يَتَسْعَىٰ لَهُمْ أَكْثَرُهُمْ أَلَا حَقٌّ أَوْ لَمْ
يَكُنْ فِي بَرٍٍ إِنَّهُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُونَ ﴿٦﴾

অর্থাৎ, “আমি ওদের জন্য আমার নির্দর্শনাবলী বিশ্লেষণে ব্যক্ত করব এবং ওদের নিজেদের (দেহ) মধ্যেও; ফলে ওদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তা সত্য। একি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে সাক্ষী।” (সূরা ফুসসিলাত ৫৩) তিনি আরো বলেন :

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْبِيَاءَنَا تَلَكُمْ شَفَّارُونَ ﴿٧﴾

অর্থাৎ, “এভাবে আল্লাহ সকল নির্দর্শন তোমাদের জন্য প্রকাশ করেন যাতে তোমরা চিন্তা করা।” (সূরা বাকারাহ ২১৯)

তিনি অন্যত্র বলেন :

فَلَمْ يَلْتَمِسْ أَغْمَىٰ وَلَمْ يَجِدْ أَفَلَا شَفَّارُونَ ﴿٨﴾

অর্থাৎ, “বল, অঙ্গ ও চক্ষুশ্বান কি সমান ? তোমরা কি অনুধাবন কর না ?” (সূরা আনআম ৫০)

এই ভাবে কুরআন মাজীদের বহু স্থানে “তোমরা কি বুঝানা? যাতে তোমরা বুঝ, যদি তোমরা বুঝ, ওরা কি জ্ঞান করে না, জ্ঞানীদের জন্য নির্দর্শন রয়েছে, তোমরা কি চিন্তা কর না? যাতে তোমরা চিন্তা কর, যাতে ওরা চিন্তা করে, চিন্তাবিদদের জন্য নির্দর্শন রয়েছে” প্রভৃতি বলে জ্ঞান ও চিন্তা করতে মানুষকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। কিন্তু অনেকে জ্ঞানকে খাটায় না।

পক্ষান্তরে কতক মানুষ আছে, যারা সর্ববিষয়ে নিজের আকেলকেই প্রাধান্য দেয়, সবকিছুকেই বিবেকের নিভিতে ওজন করে। জ্ঞানকেই ভালো-মন্দ বুঝার উৎস মনে করে। নিজেদের জ্ঞান যাকে সত্য বলে তারা তাকে সত্য মানে এবং যাকে অসত্য বলে তাকে তাই মানে যদিও তা কিতাব ও সুন্নাহর (প্রকৃত জ্ঞানের) প্রতিকূল

হয়। যার ফলে বহু বিদ্বান এই আকেলের ছাঁচে সৃষ্টি হয়েছে। এবং এরই জন্য ভ্রষ্টতা ও বহু সংখ্যক ফিতনা, বিশৃঙ্খলা ও হানাহানি সংঘটিত হয়েছে কত সুন্নত উঠে গেছে, উম্মাহর মাঝে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে এবং কিতাব ও সুন্নাহর বিভিন্ন উক্তিকে হেরফের করা হয়েছে।

অথচ, শরীয়তে এমন কিছু নেই যা মানুষের জ্ঞান ও বিবেকের প্রতিকূল। অবশ্য অনেক বিষয় আছে, মানুষের সীমিত জ্ঞান যার প্রকৃতত্ত্বের ছোঁয়া পায় না। ফলে সে তাতে বিমৃঢ় ও হয়রান হয়ে যায়। কিন্তু তা বলে জ্ঞানের বাহবলে তা অমান্য নয়। যেহেতু মানুষের জ্ঞান থাকলেও তার পরিসর সীমাবদ্ধ এবং সৃষ্টিকর্তা ও শরীয়তদাতার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অপরিসীম। তাঁর সকল হিকমত বুঝে উঠা মানুষের সাধ্য নয়। সুতরাং শরীয়তের উপর জ্ঞানের চাকা সর্ব ক্ষেত্রে সচল নয়।

কিন্তু বিরলভাবে কতক মানুষ এই নিয়মের বিরোধিতা ও ব্যতিক্রম করে। তারা নিজেদের অপরিসর জ্ঞানের বহরকে আল্লাহর নিধারিত সীমা অতিক্রম করে উর্ধ্বে বাড়িয়ে থাকে, তাদের শাক-বেচা দাঁড়িপাল্লাতে সুবৃহৎ পর্বত ও জন করতে চায় ! কেবল বিবেককেই ধর্মাধৰ্মের কষ্টপাথের মনে করে। শরীয়তের বিষয়াবলীকে জ্ঞানের ছিটারে মেঝে থাকে ! তাদের জ্ঞানে ধরে না এমন ইলাহী খবরকে রদ্দ করে দেয় এবং জ্ঞান ও রুচি থেকে হালাল ও হারাম মানে। যদিও ইলাহী কানুনে তার বিপরীত বলে ঘোষিত থাকে। ‘এতো ভালো জিনিস, ওতে ক্ষতি কি ? এটা কুসংস্কার’ ইত্যাদি বলে নবনব ভিত্তিহীন ইবাদত-অনুষ্ঠান রচনা করে থাকে অথবা ধ্বংস করে থাকে-যার অনুমতি মা’বুদ দেননি।

আকেলের ঘোড়া ছুটিয়ে বাস্তববাদীরা বহু দীনি প্রকৃতত্ত্বকে অস্মীকার ও রদ্দ করে থাকে। বিশেষ করে অদৃশ্য ও ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য বিভিন্ন ইলাহী ও নবৰী খবরকে অবিশ্বাস করে, যদিও বা তা শুন্দভাবে প্রমাণিত। যেমন- ফিরিস্তা ও জিন জগৎ, কবরের আঘাত, যাদু-প্রতিক্রিয়া, ইমাম মাহদী ও হয়রত ঈসার (আঃ) আবির্ভাব, দাঙ্গালের ফিতনা, রসূলের মিরাজ, সিনাচাক, পরকালে মীরান, হাওয়, সীরাত প্রভৃতি গায়বী বিষয়।

পক্ষান্তরে, প্রত্যেক সুস্থ-মস্তিষ্কের মুসলিমের নিকট বিদিত যে, আল্লাহ বা তাঁর রসূল থেকে যখন কোন খবর শুন্দভাবে প্রমাণিত হয় তখন তা মান্য করা অথবা রদ্দ করাতে আকেলের কোন হাত থাকে না, বরং তাতে দৃঢ় প্রত্যয় রাখা এবং মান্য করা ওয়াজের হয়ে যায় ; চাহে জ্ঞান ও বিবেক সেই খবরের প্রকৃতত্ত্বের নাগাল পায় অথবা, না পায়। যেহেতু জ্ঞান প্রত্যেক বিষয়েরই প্রকৃতত্ত্ব উপলব্ধি করতে অক্ষম।

‘হাজরে আসওয়াদ কে’ চুম্বন কালে হ্যৱত উপর ফারক (ৱাঃ) এই তত্ত্বকেই সামনে রেখে বলেছিলেন, ‘আমি জানি যে, তুমি একটি পাথর, না কাঠে উপকার অথবা অপকার সাধন করতে পার। যদি না রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুম্বন করতে দেখতাম তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।’ (বুখারী) সুতরাং ছড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, “যখন মুমিনদের আপোসের কোন বিষয়ের ফায়সালার জন্য তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা তো কেবল এ কথাই বলে, ‘আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।’ এবং ওরাই সফল কাম।” (সূরা নূর ৫১)

৫ — ইয়াম ও বুর্যুর্গদের অক্ষানুরূপ ও পক্ষপাতিত্ব

বিদআত প্রসারের এটি অন্যতম প্রধান কারণ। আকীদা ও আহকামে আল্লাহ ও রসূলের উক্তি এবং মীমাংসার উপর বিদআতীরা নিজেদের বুর্যুর্গদের কথা ও ফায়সালাকে অগ্রাধিকার দেয়। অক্ষভাবে তাই বিশ্বাস করে যা তাদের মাননীয় বুর্যুর্গ বলে। অতিরিক্তে অনেকে তাদের বুর্যুর্গকে ত্রুটিহীন নিষ্পাপ মনে করে। মনের আসনে মান্যবর বুর্যুর্গ বা আলেমকে এমন স্থান দেয় যে সে যা বলে বা যা করে তাই তাদের ধর্ম, কর্তব্য ও বিশ্বাস হয়। এবং এর বিপরীত সবকিছু অধর্ম ও অমান্য হয়; যদিও বা এই বিপরীত কর্ম ও বিশ্বাস কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ বর্তমান থাকে। ব্যক্তি পূজার এই অতিরিক্তভাবে অনেকে মনে করে যে, তাদের বুর্যুর্গ যা জানে তা আর অন্য কেউ জানে না বা জানতে পারে না।

ঠিক অনুরূপ অবস্থা বহু ম্যহাবের মুকাল্লেদগণের ও হয়ে থাকে, তাদের ইয়াম বা ফুকীহ যা বলেন অক্ষভাবে তাই তারা মান্য করে এবং এর প্রতিকূল সমষ্ট কথা ও অভিযন্তকে অনায়াসে রদ করে দেয়; যদিও বা তা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ হয়। কেবল মাত্র ইয়ামের কথায় সম্পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখে। বরং এখানেই শেষ নয়। ওদের অনেকে বলে থাকে যে, ‘প্রতি সেই আয়াত ও হাদীস যা আমাদের ম্যহাবের বিপরীত ও বিরুদ্ধ হয় তা ব্যাখ্যে অথবা রহিত (মনসুর)।’ (রেসালা কারবী)

এই তকলীদ মুসলিমদের মাঝে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। কঠিন অক্ষ-পক্ষপাতিত্বের ফলে বিদআত বেড়ে চলেছে। যার কারণে কেউ আর কুরআন-হাদীস শুনতে চায় না। ইঁজতিহাদের দরজা বন্ধ করে অনেকে বলে, ‘ওসব আমাদের বুর্বার ক্ষমতা নেই, তাঁরা সব বুঝে প্রকাশ করে গেছেন।’

অথচ, একথা বিদিত যে, ইয়ামগণের নিকট সকল সহীহ হাদীস পৌছেনি। পৌছলে নিশ্চয়ই তার বিপরীত কোন রায় তাঁরা দিতেন না। কারণ তাঁরা সকলেই কুরআন ও হাদীসেরই অনুসারী ছিলেন-এতে কোন সন্দেহ নাই। তবে তাঁরা

মুজতাহিদ মানুষ ছিলেন। তাদেরও ভুল হতে পারে। যেমন তারা সকলেই তাদের কারো অক্ষানুকরণ করতে কঠোরভাবে নিয়েধ করে গেছেন এবং তাদের কোন কথা কোন সহাহ হাদীসের প্রতিকূল বা খেলাপ হলে হাদীসের মতকেই গ্রহণ করতে আদেশ করে গেছেন।

সুতরাং মানুষ কিয়ামতে জিজ্ঞাসিত হবে যে, তারা কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করেছিল কিনা? কোন ইয়াম বা বৃষ্ণুরের অনুসরণ করেছিল অথবা না করেছিল সে সম্পর্কে তাদেরকে কৈফিয়ত করা হবেনা। স্মষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলা ভুট্ট জননেতা ও তাদের অনুসারীদের প্রসঙ্গে বলেন :

يَوْمَ تُثْلِبُ وَجْهَهُمْ فِي الْتَّارِيَخِ يَقُولُونَ يَدْعَيْنَا أَطْعَمَنَا اللَّهُ وَأَطْعَمَنَا
الرَّحْمَنُ لَا ۝ وَقَاتَلُوا رَجُلًا إِذَا أَطْعَمَنَا سَادَتْنَا وَكَبَرَ أَمْدًا فَاضْلُونَا الشَّيْبَلَةُ
۝ رَبَّنَا ۝ عَاتَاهُمْ ضَيْقَيْنِ مِنْ أَنْفُسَابِ وَأَنْفُسَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ۝

অর্থাৎ “যেদিন অগ্নিতে ওদের মুখমণ্ডল উল্টে-পাল্টে দক্ষ করা হবে সে দিন ওরা বলবে, ‘হায় আমরা যদি আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করতাম’ ওরা আরো বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা আমাদের নেতা ও গুরুদের আনুগত্য করেছিলাম এবং ওরা আমাদেরকে পথ ভুট্ট করেছিল ; হে আমাদের প্রভু ! ওদেরকে দ্বিগুন শাস্তি দিন এবং মহা অভিসম্পাত করুন।’ (সুরা আহ্যাব ৬৬-৬৮)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সকলকে তামাতু হজ্জ করতে আদেশ করতেন। (যেহেতু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সকলকে সেই আদেশই করেছিলেন।) এক প্রতিবন্দী বলল, ‘না, তামাতু করা জরুরী না। কারণ আবু বকর ও উমর নিষিদ্ধ করেন। (এবং তারা আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও আনুগত্যের অধিক হকদার।) তা শুনে ইবনে আব্বাস বললেন, ‘অবিলম্বে তোমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ হবে। আমি তোমাদেরকে বলছি, ‘আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন এবং তোমরা বলছ ’আবুবকর ও ওমর বলেছেন? (যাদুল মাআদ ২। ১৯৫, ২০৬)

সুতরাং উদার ও অকুণ্ঠ মনে যে এই নীতিকে বুঝে নেবে তার নিকট সকল প্র্যাচ ও সমস্যা বক্ষ হারিয়ে সহজ হয়ে যাবে। আর ইসলামে কোন দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট থাকবে না। বিদআত আখড়া ছেড়ে পলায়ন করবে এবং উক্ত স্থানে সুন্নাহ শোভমান হবে।

৬ — বিদআতীর সংসর্গ

বিদআতীর সংসর্গ ও সাহচর্য বিদআত প্রসারে সহায়ক হয় ; বিশেষ করে যদি সহচরের কোন পার্থক্য জ্ঞান না থাকে। আবার সময়-কাল দীর্ঘ্যতার সাথে সাথে বিদআতকে লঘু জ্ঞান (বরং সুন্নাহ মনে) করা হয়। ফলে সাধীর মত সাধীও এ বিদআতে আমল শুরু করে বসে। এই সংসর্গ প্রসংগে বহু সতর্কবাণী পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

৭ — ওলামাদের নীরবতা ও সুর্যাষ্ট্রেষিতা

আল্লাহ পাক বলেন :

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أَمْمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٩﴾

অর্থাৎ, “তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎকার্য থেকে নিষেধ করবে এবং ওরাই হবে সফলকাম।” (সূরা আলে ইমরান, ১০৪)

কিন্তু এই উম্মাহ যে সমস্ত বিপদ ও দুর্বলতার সম্মুখীন তার মধ্যে ওলামাদের আলস্য ও নীরবতা অন্যতম। আল্লাহর অর্পিত এই মহান দায়িত্ব পালনে ওলামাগণ তোষামদ ও মনোরঞ্জনের পথ অবলম্বন করেছেন। উদর পূর্তি অর্থ লাভ, কিছু আনন্দোপভোগ, পদ ও গদি বহাল প্রভৃতি সুর্যলাভের খাতিরে বিদআত থেকে নিষেধ করা তো দূরের কথা বরং তাতে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন। বরং তার চেয়েও বিস্ময়কর কথা এই যে, সুর্যবশে তাতে শরীক হয়ে তার সুষ্ঠু উদ্ধাপন করে থাকেন। যাদের অনেকে বেনামায়ীর জানায়া পড়েন না। কিন্তু তার চালসে (মিলাদ) পড়তে বা তার নামে কুরআনখানী বা শব্দীনা পড়তে কখনো ভুল করেন না।

অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে, কর্তব্য-পরায়ণ আলেমই সমাজে নেই। এমন আলেম তো প্রতি দেশ ও যুগে থেকেছেন ও আছেন ; যাঁরা সুন্নাহ থেকে বিদআতের পার্থক্য-নির্বাচন করেন এবং ভালো-মন্দ বিচার করে ভালোর পথে চলতে সমাজকে আদেশ করেন। বিদআতকে দন্তরমত খঙ্গ করেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। আর লোকেরাও তাদেরকে চিনতে ভুল করে।

প্রতিহত না হলে বাতিল খুব শীঘ্ৰই বেড়ে উঠতে থাকে। ওলামাদের তরফ থেকে কোন বাধা না পেলে বিদআত অবজীলাক্রমে বিস্তার লাভ করতে থাকে। বৱং এই নীৱৰতা অনুমতি ও সমৰ্থনেৰ লক্ষণ হয় এবং সমাজে তা সুন্নাহ বলে সুপৱিচিত হতে থাকে।

বৰ্তমানে মুসলিম জাহানেৰ প্ৰতি দৃষ্টি ফিৱালে দেখা যাবে যে, কত সুন্নামধন্য ওলামাৰ কণ ও চক্ৰৰ সামনে ছোট-বড় কত বিদআত ঘটছে ও বেড়ে চলেছে অথচ তাৰ প্ৰতিবাদ ও প্ৰতিকাৱে সুন্ন কয়েকজন ব্যতীত কেউ মুখ খুলেন না বা কলম ধৰেন না। বৱং গদি ও পজিশন যাবাৰ আশঙ্কায় অথবা কোন কৃটনীতিৰ খাতিৱে অনেকে তাতে অংশ গ্ৰহণ কৰে থাকেন। যাতে সাধাৱণ মানুষেৰ মনে এই ধাৱণা জম্মে যে, ‘তা বিদআত নয় বৱং সুন্নাহ। তা না হলে অমুক সাহেব কৰবেন কেন? আবাৰ কেউ যদি বাধা দিতে চান তাহলে তিনি শুনবেন, ‘তুমি আৱ কতটুকু জানো? বিদআত হলে অমুক (জাঁদৱেল) সাহেব বলে যেতেন না, বলতেন না বা কৰতেন না। তাৱা কি আলেম ছিলেন না। ওৱা কি আলেম নন, ওৱা কুৱআন হাদীস জানেন না, বা বুৰেৱ না? যত নতুন আলেম তত নতুন নতুন ফতোয়া নতুন নতুন হাদীস! ইত্যাদি।

কিন্তু এ মিসকীনৱা জানে না যে, সব বিষয় সবাৱই পক্ষে জানা বা উপলব্ধি কৱা সম্ভব নয়। যেমন- সুন্নাহৰ সহীহ-য়য়ীফ-ঘওযুৱ পাৰ্থক্যজ্ঞান সকলেৰ কাছে থাকে না। আবাৰ সমস্যা আৱো অধিক ঘোৱতৰ হয় তথনই যখন প্ৰতিবাদ শুনে পূৰ্বোক্ত সাহেব মানহানিৰ ভয়ে হক কৰুল কৰতে না চান। পক্ষান্তৰে যাবা হক বলতে চুপ থাকে তাৱা বোৱা শয়তান। (অবশ্য যেখানে ফিতনাৰ ভয় থাকে সেখান কাৱ কথা ভিন্ন।) তাই অন্যায়েৰ প্ৰতিবাদে আলস্য সাজে না। ভয়, দুৰ্বলতা বা তোষামদ মানায় না। দুৰ্বল ঈমানেৰ পৰিচয় দিয়ে কেবলমাত্ৰ অন্তৰ দ্বাৱা ঘৃণাই যথেষ্ট নয়। ‘আল্লাহৰ দ্বীন, আল্লাহই সকলেৰ উচিত বিচাৱ কৰবেন’ বলে গড়িমসি চলেনা, অথবা ‘এ কাজেৰ জন্য আমি ছাড়া আৱো অনেক লোক আছে’ বলে কৰ্তব্যহীনতা প্ৰকাশ শোভা পায় না। আলেম হয়ে (সামৰ্থ্যানুযায়ী) আলেমেৰ ভূমিকা ও কৰ্তব্যপালন না কৱলে তিনি বড় যালেম হবেন নিজেৰ জন্য এবং সমাজেৰ জন্যও।

অনেকে বলেন, ‘সুন্নাহৰ প্ৰচাৱ কৰতে গিয়ে জামায়াতেৰ মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য সৃষ্টি হয়, ফলে সুন্নাহৰ প্ৰচাৱ ফিতনাৰ কাৱণ হয়; তাই চুপ থাকাই ভালো।’ কিন্তু প্ৰকৃত পক্ষে সুন্নাহৰ প্ৰচাৱ ফিতনাৰ কাৱণ হয় না বৱং সুন্নাহৰ প্ৰতি অজ্ঞতাই ফিতনাৰ কাৱণ। যেমন যে সহীহ সুন্নাহৰ প্ৰচাৱ কৰলে বলে, ‘এটা নতুন হাদীস-সে এই কথা দ্বাৱা এই দাবী কৱে যে, সে যাবতীয় হাদীস শুনে ফেলেছে এবং দ্বীনেৰ সমস্ত আহকাম জেনে ফেলেছে, তাই এই সুন্নাহ তাকে নতুন লেগেছে। অথচ বস্তুত পক্ষে সুন্নাহ নতুন হয় না। সুন্নাহ তো সেই চৌদ্দ শতাব্দীৰ পুৱাতন। অবশ্য সুন্নাহৰ

প্রচার নতুন হতে পারে। কিন্তু ঐ মিসকীন নতুন বলে না জেনে রদ করতে চায়। অর্থাৎ তার উচিত কেবল মান্য করা এবং নিজের অস্তিত্বের উপর আক্ষেপ করা।

মোট কথা, বিদআত ও কুসংস্কারাদি দেখে আলেমের নির্বাক থাকা মোটেই উচিত নয়। হিকমত ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে নিজের ইলম প্রয়োগ করা উচিত। যে জ্ঞান আল্লাহ তাকে দান করেছেন তা গোপন করা আদৌ বৈধ নয়। আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُفُونَ تَمَّاً أَنْزَلْنَا مِنْ آتِنَا يَتَعَذَّرُ
مِنْ تَعْدِي مَا يَبْتَلِي لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ إِذْ أَنْزَلْنَا مِنْهُمْ آتِنَا
وَيَعْلَمُنَّاهُمْ الْأَنْجِلَوْنَ ﴿١٩﴾

অর্থাৎ, “আমি যে সব স্পষ্ট নির্দশন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, মানুষের জন্য খোলাখুলি ভাবে আমি কিতাবে ব্যক্ত করার পরও যারা ঐ সকল গোপন রাখে, আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ করেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ করে।” (সূরা বাকারা ১৫৯)

তিনি আরো বলেন :

وَإِذَا أَخْذَ اللَّهُ مِيقَاتِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَشَيْءٍ مُّحْمَدٌ لِلنَّاسِ وَلَا
تَكْثُرُوهُمْ فَتَبَدُّلُهُمْ وَرَاءَ ظُفُورِهِمْ وَأَغْرِيَهُمْ بِهِ فَمَا قَاتَلُوا لِفِتنَةٍ مَا
مُظْعَنُونَ ﴿٢٠﴾

অর্থাৎ, “(শ্বরণ কর), যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ তাদের নিকট প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, ‘তোমরা উহা স্পষ্ট ভাবে মানুষের নিকট প্রকাশ করবে এবং উহা গোপন করবে না।’ এরপরও তারা উহা পৃষ্ঠাপিছে নিষ্কেপ করে (অগ্রহ্য করে) ও সুরু মূল্যে বিক্রয় করে। সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট!?” (সূরা আলে ইমরান ১৮৭)

প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি জানা কোন ইলম (ধীনী জ্ঞান)সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার মুখে আগনের লাগাম দেবেন।”

৮ — বিজাতির অনুকরণ

বিজাতির অনুকরণ করেও মুসলিম নিজের পরিবেশে বিদআত সৃষ্টি করে থাকে। অমুসলিমের কর্মকে পছন্দ করে তা নিজের করণীয় ধর্ম ভেবে বসে। যেমন সাহাবী আবু ওয়াকেদ আল-লাইসী বলেন, ‘একদা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত আমরা হনাইনের পথে বের হলাম। তখন আমরা সদ্য নও

মুসলিম ছিলাম। মুশারিকদের একটি কুল গাছ ছিল ; যার নিকটে ওরা ধ্যানমগ্ন হত, এবং তাদের অন্ত-শন্ত্রকে তাতে ঝুলিয়ে রাখত-যাকে ‘যাতে আনওয়াত’ বলা হত। সুতরাং আমরা এক কুল গাছের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। (তা দেখে) আমরা বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের জন্য একটি ‘যা-তে আনওয়াত’ করে দিন যেমন ওদের রয়েছে। (তা শুনে) তিনি বললেন, ‘আল্লাহ আকবার ! এটাই তো পথরাজি ! যাঁর হাতে আমার জীবন আছে তাঁর কসম ! তোমরা সেই কথাই বললে যে রূপ বনী ইসরাইল মুসাকে বলেছিল, ‘আমাদের জন্য এক দেবতা গড়ে দিন যেমন ওদের অনেক দেবতা রয়েছে।’ তিনি বলেছিলেন, ‘তোমরা মৃৎ জাতি !’ অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী (জাতির) পথ অনুসরণ করবে।” (তিরমিজি ২১৮০ মুঃ আহমেদ ৫।২১৮)

অতএব এই হাদীসে স্পষ্ট হয় যে, কাফেরদের অনুকরণই বনী ইসরাইল এবং কিছু নও মুসলিম সাহাবীকে এমন নিষ্ঠ আবেদনে উদ্ভুদ্ধ করেছিল। এবং সে আবেদন ছিল এমন মাঝবুদ গড়া বা নির্দিষ্ট করার যেমন কাফেরদের ছিল। যার নিকট তারা ধ্যানমগ্ন হত, বর্কতের আশায় তার উপর অন্ত ঝুলাত এবং আল্লাহকে ছেড়ে তার আরাধনা করত।

বন্ধুতঃ এই পরিস্থিতিই বর্তমান কালেও বিরাজমান। যেহেতু অধিকাংশ মুসলিম দলই কাফেরদের অনুকরণ করে বিদআত, শির্ক, কুসংস্কার যেমন, দগ্ধাপজ্ঞা, কবরের উপর পৃষ্ঠাঘ-দান, জন্মদিন, বার্থ-ডে, নবী দিবস পালন, নির্দিষ্ট দিনে খাদ্য ভক্ষণ, ইসলামী কোন ঐতিহাসিক দিনকে কেন্দ্র করে উৎসব পালন, স্মারক দিবস উদযাপন, স্মারক মূর্তি প্রতিষ্ঠা করণ, শোকদিবস পালন, জানায়ার বিভিন্ন বিদআত রচনা, সমাধির উপর মায়ার নির্মাণ প্রভৃতি কর্ম ধর্ম ও নাজাতের অসীলা ভেবে আবিষ্কার করেছে-যার কোন দলীল আল্লাহ অবতীর্ণ করেন নি।

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সত্যই বলেছেন, অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অনুসরণ করবে বিঘত বিঘত এবং হাত হাত পরিমাণ (সম্পূর্ণ রূপে), এমনকি তারা যদি গোসাপের গর্তে প্রবেশ করে তবে তোমরাও তাদের অনুসরণ করবে (এবং তাদের কেউ যদি রাস্তার উপর (প্রকাশে) স্তু-সংগম করে তবে তোমরাও তা করবে।)” সাহাবাগণ বললেন, ‘আল্লাহর রসূল ইয়াহুড ও শ্রীষ্টানরা ?’ তিনি বললেন, “তবে আবার কারা ?” (বুখারী, মুসলিম ও হাকেম)

আর সাহাবী হ্যাইফাহ বিন্ আল-ইয়ামানও সঠিকই বলেছেন, “তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথের অনুসরণ করবে জুতার পরিমাপের মত (পুরাপুরি খাপে-খাপে), তোমরা তাদের পথ ভুল করবে না এবং তারাও তোমাদেরকে (সংগে করতে) ভুল করবে না। এমনকি তারা যদি শুষ্ক অথবা নরম পায়খানা খায় তাহলে

তোমরাও তা (তাদের অনুসরণে ‘নিউ ফ্যাশন’ মনে করে) খাবে।’(আল-বিদাউ অন্ন নাহয় আনহা, ইবনে ওয়ায় যাহ ৭১ পঃ তানবীহ উলিল আবসার ১৭২ পঃ)

৯ — কাশ্ফ ও সুপ্ত

এক গ্রেগীর পীর, দরবেশ, ফকীর বা সূফীদের দাবী যে, তাদের নিকট নাকি বহু বিষয়ে আল্লাহর তরফ থেকে কাশফ হয়, যেমন আল্লাহর নবীর প্রতি ওহী হতো। আবার অনেকে সৃপ্তে বা জাগ্রতাবস্থায় আল্লাহ অথবা তাঁর নবীর সহিত সাক্ষাৎ করে সরাসরি দীনী ও নাজাতের জ্ঞান এবং পথ অর্জন করে থাকে ! আর এর হাওয়ালায় নতুন-নতুন দীনী আচার-অনুষ্ঠান আবিষ্কার করে থাকে। শুধু তাই নয়, বরং তারা এই নিয়ে গর্বও করে, তাদের ঐ জ্ঞান (?) কে কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়, কিতাব ও সুন্নাহর আলেমের প্রতি ঝুকুটি নেড়ে বলে, ‘তোমাদের সনদ (বর্ণনা সূত্র) তো এক মৃত ব্যক্তি হতে অপর এক মৃত ব্যক্তি। কিন্তু আমরা সরাসরি আল্লাহ রববুল আলামিনের নিকট হতে ইলম গ্রহণ করে থাকি।’ তাই তাদের সনদে তারা বলে, আমার প্রভু হতে আমার হাদয় আমাকে বয়ান করেছে যে,।’ বলে, ‘তোমাদের কিতাবী ইলম, আর আমাদের কালবী ইলম, কলবে কলবে বাতেনী ইলম ! মৌলভীরা তেটপাতার মত পানির (ইলমের) উপর ভেসে বেড়ায়, আমরা পানির (ইলমের) গভীরে প্রবেশ করি’ ইত্যাদি বুলি আওড়ে কিতাব ও সুন্নাহ ছেড়ে দীনী বিধানের তৃতীয় উৎস রূপে তাদের মনের মানস কল্পনা ও ভাবাবেগকে শ্রেষ্ঠ কারামত বলে জাহির করে এবং বহু অঙ্গ তাদের সেই কান্নানিক কথার অনুসরণ করে নিজেদেরকে কৃতার্থ মনে করে অর্থ তারাই সর্বনাশগ্রস্ত বিদআতী।

১০ — যয়ীফ ও হাদীসের উপর ভিত্তিকরণ

অধিকাংশ বিদআতীরা দুর্বল বা গড়া হাদীসের উপর ভিত্তি করে বিদআত (আমল) করে থাকে। এই ধরনের হাদীস ব্যাপকভাবে প্রচার করে থাকে। এর দ্বারা তাদের লিখিত কিতাবের কলেবর ও মূল্য বৃদ্ধি করে থাকে। অর্থাৎ ঠিক একই সময়ে বহু সংখ্যক সহীহ হাদীসকে রদ করে থাকে। তার উপর আমল করতে অজুহাত পেশ করে বলে, ‘ঐ হাদীস অস্লের খেলাপ,’ অথবা ‘ওটা খবরে ওয়াহেদ’ ইত্যাদি, এবং এই ধরনের খোঢ়া ওজরে কত সুন্নত বরং ওয়াজের ত্যাগ করে বসে।

আবার প্রতিবাদ করে যদি ওদেরকে বলা হয় যে, ‘যে হাদীসের উপর ভিত্তি করে আমল করছেন তা তো যয়ীফ অথবা মওয়ু’ তখন ওরা তার প্রত্যুভরে এমন কথা বলে যা অর্থহীন। যেমন বলে যে, ‘ফায়ায়েল আমালে যয়ীফ হাদীসের উপর আমল চলবে।’ ইত্যাদি। অর্থাৎ একথা শতহীন নয়। (দেখুন তানবীহ উলিল আবসার)

“মুহাদ্দেসীন ও অসূলিহ্যীনদের নিকট যথাস্থানে নির্দিষ্ট শর্তাবলীর সহিত ফায়ায়েলে আমালে যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা যায়।” এই কথার উপর দুটি আপত্তিমূলক টিপ্পনী রয়েছে।

১— এই উক্তি হতে অনেকেই ‘সাধারণ’ বা ‘ব্যাপক’ অর্থ বুঝে থাকে। মনে করে যে, উক্ত আমলে ওলামাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। অথচ এ রকমটা নয়। বরং তাতে বিদিত মতভেদ বর্তমান যা বিভিন্ন হাদীসের পারিভাষিক (অস্লেহাদীসের) গ্রন্থ সমূহে বিশদ ভাবে আলোচিত। যেমন আল্লামা শায়খ জামালুদ্দীন কাসেমী (রঃ) তার গ্রন্থ (কাওয়ায়েদুল হাদীসে) আলোচনা করেছেন।

তিনি ১১৩ পৃষ্ঠায় ইবামগণের এক জামাআত থেকে নকল করেন যে, তাঁরা আদপে যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা ঠিক মনে করতেন না। যেমন ; ইবনে মায়ীন, বুখারী, মুসলিম, আবু বকর ইবনুল আরাবী প্রভৃতিগণ। এন্দের মধ্যে ইবনে হায়ম অন্যতম ; তিনি তার গ্রন্থ ‘আলমিলাল অন নিহাল’ এ বলেন, ‘(সেই হাদীস দ্বারা আমল সিদ্ধ হবে) যে হাদীসকে পূর্ব ও পশ্চিমের লোকেরা (অর্থাৎ বহু সংখ্যক লোক) কিংবা সকলেই সকল হতে কিংবা বিশৃঙ্খল বিশৃঙ্খল হতে নবী সাল্লালাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছে। কিন্তু যে হাদীসের বর্ণনা - সূত্রে কোন মিথ্যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি, কিংবা কোন অমনোযোগী গাফেল ব্যক্তি কিংবা কোন পরিচয়হীন অজ্ঞাত ব্যক্তি থাকে তাহলে সেই হাদীস (যয়ীফ হওয়া সত্ত্বেও তার) দ্বারা কতক মুসলিম বলে থাকে (আমল করে থাকে)। অবশ্য আমাদের নিকট এমন হাদীস দ্বারা কিছু বলা (বা আমল করা), তা সত্য জানা এবং তার কিছু অংশ গ্রহণ করাও অবৈধ।’

হাফেয ইবনে রজব তিরমিয়ির ব্যাখ্যা পুস্তকে (২। ১১২তে) বলেন, ‘ইমাম মুসলিম তার সহীহ গৃন্থের ভূমিকায় যা উল্লেখ করেছেন তার প্রকাশ্য অর্থ এই বুঝায় যে তরঙ্গীব ও তরহীবে (অনুপ্রেরণাদায়ক ও ভৌতি সঞ্চারক) এর হাদীস ও তার নিকট হতেই বর্ণনা করা হবে যার নিকট হতে আহকাম (কর্মাকর্ম সম্পর্কিত) এর হাদিস বর্ণনা করা হয়। (অর্থাৎ যয়ীফ রাবী হতে যেমন আহকামের হাদীস বর্ণনা করা হয় না তেমনিই সেই রাবী হতে তরঙ্গীব ও তরহীবের হাদীস ও বর্ণনা করা হবে না।)

এ যুগের অদ্বিতীয় মুহাদ্দেস আল্লামা আলবানী হাফেয়াহল্লাহ বলেন, ‘এই অভিমত ও বিশ্বাস রেখেই আমি আল্লাহর আনুগত্য করি এবং এই অভিমতের প্রতিই মানুষকে আহ্বান করি যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা আদপে আমল করা যাবে না,- না ফায়ায়েল ও মুস্তাহাব আমলে আর না অন্য কিছুতে। কারণ যয়ীফ হাদীস কোন বিষয়ে অনিশ্চিত ধারণা জন্মায় মাত্র (যা নিশ্চিতরণে রসূল সাল্লালাহু আলাইহি

অসাল্লামের বাণী নাও হতে পারে।) (১) এবং আমার জানা মতে, ওলামাদের নিকট এটা অবিসংবাদিত। অতএব যদি তাই হয় তবে কিরণে ঐ হাদীস দ্বারা আমল করার কথা বৈধ বলা যায় ? অথচ আল্লাহ আয়া অজাল্লা তাঁর কিতাবে একাধিক স্থানে ‘ধারণা’ নিষ্ঠাবাদ করেছেন; তিনি বলেন :

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَجْعَلُونَ إِلَّا لِطَقْنٌ لَا يُفْتَنُونَ مِنْ الْحَقِّ

شَيْئًا

অর্থাৎ, “ওদের এব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই, ওরা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে অথচ সত্যের বিরুদ্ধে অনুমানের (ধারণা) কোন মূল্য নেই। (সুরা নাজর ২৮)

আর আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “তোমরা অনুমান (ধারণা) করা হতে বাচ। অবশ্যই অনুমান করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা।” (বুখারী ও মুসনিম)

জেনে রাখুন যে, আমি যে রায় এখতিয়ার করেছি তার প্রতিপক্ষের নিকট (এই রায়ের বিপক্ষে) কিতাব ও সুন্নাহ থেকে কোন দলীল নেই। অবশ্য গরবর্তী যুগের কোন আলেম তার গ্রন্থ ‘আলআজবিবাতুল ফাযেলাহ’ তে এই মাসআলার উপর নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদে (৩৬-৫৯ পৃঃ) ওদের সমর্থনে (ও আমাদের এই অভিমতের বিরুদ্ধে) দলীল পেশ করার প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সৃপক্ষে অন্তঃপক্ষে একটিও এমন দলীল উল্লেখ করতে সক্ষম হননি যা হজ্জতের উপযুক্ত ! হ্যাঁ তবে কিছু এমন উক্তি যা তাদের কারো কারো নিকট হতে নকল করেছেন, যে গুলি উক্ত বিতর্ক ও সমীক্ষার বাজারে অচল। এতদ্সত্ত্বেও ঐ সমস্ত উক্তির কিছু কিছুতে পরম্পর বিরোধিতাও বিদ্যমান। যেমন ৪১ পৃষ্ঠায় ইবনুল হমাম হতে নকল করেন, “গড়া ন্য এমন যয়ীফ হাদীস দ্বারা ইস্তিহবাব প্রমাণিত হবে।” অতঃপর ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠায় জালালুদ্দীন দাওয়ানী হতে নকল করেন, তিনি বলেছেন, একথা সর্বসম্মত যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা শরীয়তের ‘আহকামে খামসাহ’ (অর্থাৎ ওয়াজেব, মুস্তাহাব, মুবাহ, মকরহ ও হারাম) প্রমাণিত হবে না এবং ওর মধ্যে ইস্তিহবাবও।

আমি (আলবানী) বলি, ! একথাটাই সঠিক। যেহেতু অনুমান দ্বারা আমল নিষিদ্ধ এবং যয়ীফ হাদীস অনিশ্চিত অনুমান বা ধারণা সৃষ্টি করে, যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

(১) অনেকে বলে থাকে যে, ‘কসম করে বলতে পারবে, যয়ীফ হাদীস রসূলের উক্তি নয়?’! উক্তরে বলা যায় যে, ‘তা বলা যাবে না ঠিক। কিন্তু কসম করে এও বলতে পারা যাবে না যে, ‘যয়ীফ হাদীস তাঁর উক্তি।’ সুতরাং সন্দিহান বিদ্যমান, যা ত্যাগ করাই উত্তম এবং পূর্বসতর্কতামূলক কর্ম।

মোট কথা, ফায়ায়েলে আমাল বলতে এমন আমল যার ফয়ীলত আছে, তা যয়ীফ হাদীসের উপর ভিত্তি করে করা যাবে না। করলে তা বিদআত বলে গণ্য হবে। যেহেতু যয়ীফ হাদীস দ্বারা কোন আহকাম বা আমল (অনুরূপ কোন বিশ্বাসও) সাব্যস্থই হয় না। তবে এমন আমল যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে তার ফয়ীলত বর্ণনায় আমল করা যায়- তবে তারও শর্ত আছে যা পরে বলা হবে।

উদাহরণ সূর্য, চাশ্তের নামায সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (মুসলিম) কিন্তু তার ফয়ীলত প্রসংগে এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, ‘যে ব্যক্তি ঐ নামায পড়বে তার পাপ সমুদ্রের ফেনার সমান হলেও ক্ষমা করে দেওয়া হবে’ (আবুদাউদ, তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ)

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি নিয়মিত বার রাকআত চাশ্তের নামায পড়ে তার জন্য আশ্লাহপাক বেহেস্তে এক সোনার মহল তৈরী করেন। (তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ)

আর এই দুটি হাদীসই যয়ীফ। চাশ্তের নামাযের এই ফয়ীলত বিশ্বাসে (ওঁদের মতে) তা ব্যবহার করা যায়।

অনুরূপভাবে কুরবানী করা ও তার মর্যাদা কুরআন ও সুন্নাহতে প্রমাণিত তার ফয়ীলত বর্ণনায় (ওঁদের মতে কিছু শর্তের সাথে) “কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে এক একটা নেকী” এই হাদীস ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

এ বিষয়ে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) বলেন, ‘শরীয়তে যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি করা বৈধ নয়, যা সহীহ বা হাসান নয়। কিন্তু ইমাম আহমদ বিন হামুল প্রভৃতি ওলামাগণ ফায়ায়েলে আ’মালে সাবেত (প্রমাণ সিদ্ধ) বলে জানা না যায় এমন হাদীস বর্ণনা করাকে জায়েয বলেছেন,- যদি তা (এ যয়ীফ হাদীস) মিথ্যা বলে জানা না যায় তবে ।

অর্থাৎ যখন জানা যাবে যে, আমল শরয়ী (সহীহ) দলীল দ্বারা বিধেয় এবং তার ফয়ীলতে এমন হাদীস বর্ণিত হয় যা মিথ্যা (মওয়ু) বলে জানা যায় না- তাহলে ঐ (হাদীসে বর্ণিত) সওয়াব সত্য হতে পারে (এই বিশ্বাস করা যায়)। কিন্তু ইমামগণের কেউই এ কথা বলেননি যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা কোন কিছুকে ওয়াজের অথবা মুস্তাহাব করা যাবে। এবং যে একথা বলে সে ইজমা (সর্বাবাদি-সম্মতি)র বিরোধিতা করে। তদনুরূপ, কোন শরয়ী (সহীহ) দলীল ছাড়া কোন কিছুকে হারাম করাও অবৈধ। কিন্তু যদি (কোন সহীহ হাদীস দ্বারা) তার হারাম হওয়ার কথা বিদিত হয় এবং এ কাজের

কর্তার জন্য শাস্তি বা তিরক্ষারের কথা কোন এমন (দুর্বল) হাদীসে বর্ণিত হয়-যা মিথ্যা বলে জানা না যায়-তবে তা (ঐ শাস্তির বিশ্লেষ) বর্ণনা করা বৈধ।

অনুরূপ ভাবে তরগীবও তরহীবে ঐরূপ হাদীস বর্ণনা করা বৈধ হবে যদি তা মিথ্যা (গড়া) বলে পরিচিত না হয়। কিন্তু একথা জানা জরুরী হবে যে, আল্লাহ এ বিষয়ে এই অজ্ঞাত-পরিচয় হাদীস ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় (সহীহ) দলীলে তরগীব বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ইসরাইলিয়াতও তরগীব ও তরহীবে বর্ণনা করা যায়-যদি তা মিথ্যা বলে বিদিত না হয়। এবং যখন জানা যায় যে, ঐ বিষয়ে আল্লাহ পাক আমাদের শরীয়তে আদেশ দান করেছেন অথবা নিষেধ করেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র অপ্রমাণিত (অশুর) ইসরাইলিয়াত দ্বারা আমাদের শরীয়ত প্রমাণ করা হবে- একথা কোন আলেম বলেন না, এবং ইমামগণ এই ধরনের কোন হাদীসকেই শরীয়তের বুনিয়াদ করেন না। আহমদ বিন হায়ুল এবং তার মত কোন ইমামই শরীয়তে ঐ ধরনের হাদীসের উপর নির্ভর (ভিত্তি) করতেন না। যে ব্যক্তি নকল করে যে, আহমদ যয়ীফ হাদীসকে হজ্জত (বা দলীল) করতেন- যে হাদীস সহীহ বা হাসান নয়- তবে ‘নিশ্চয় সে তার উপর ভুল বলে’ (আল কায়েদাতুল জালীলাহ, ৮২ পৃঃ মজমুআ ফাতাওয়া ১/২৫১)

আল্লামাহ আহমদ শাকের ‘আল-বায়েসুল হাদীস গ্রন্থে (১০১ পৃঃ) বলেন, ‘আহমদ বিন হায়ুল, আব্দুর রহমান বিন মাহনী এবং আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রঃ) এর উত্তি, ‘যখন আমরা হালাল ও হারামে (আহকামে) হাদীস বর্ণনা করি তখন কড়াকড়ি করি এবং যখন ফায়ায়েল ইত্যাদিতে বর্ণনা করি তখন শৈথিল্য করি।’ আমার মতে - আল্লাহ আলাম- তাঁদের বলার উদ্দেশ্য এই যে, শৈথিল্য কেবল হাসান হাদীস গ্রহণে করতেন- যা ‘সহীহ’ এর দর্জায় পৌছায় না। কারণ সহীহ ও হাসানের মাঝে পার্থক্যরূপ পরিভাষা তাঁদের যুগে স্পষ্ট স্থিত ছিল না। বরং অধিকাংশ পূর্ববর্তীগং হাদীসকে কেবল সহীহ অথবা যয়ীফ (এই দুই প্রকার) বলেই মনে করতেন।
(সূত্রাঃ তাঁদের ঐ শৈথিল্য যয়ীফ হাদীস বর্ণনায় নয়, হাসান হাদীস বর্ণনায়।)

আল্লামা আলবাণী বলেন, ‘আমার নিকট এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা রয়েছে, তাদের এ উল্লিখিত শৈথিল্য ইসনাদ (বর্ণনা সূত্র) সহ যয়ীফ হাদীস রেওয়ায়ত করার উপর মান যায়- যেমন তাদের বর্ণনার ধারা ও প্রকৃতি ; যে ইসনাদ সম্মতের মাধ্যমে হাদীসের দুর্বলতা জানা সম্ভব হয়। সূত্রাঃ কেবলমাত্র সনদ উল্লেখ করাই যথেষ্ট হয় এবং ‘যয়ীফ’ বলে বিবৃত করার প্রয়োজন আর থাকে না। কিন্তু ঐ ধরনের হাদীস বিনা সনদে বর্ণনা করা- যেমন পরবর্তীকালে ওলামাগণের ধারা ও প্রকৃতি এবং তার

দুর্বলতা বর্ণনা না করা- যেমন ওঁদের অধিকাংশের রীতি-এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা থেকে তাঁরা (ইমাম আহমদ প্রভৃতিগণ) বহু উৎরে এবং এ বিষয়ে তাঁরা আল্লাহকে অধিক ভয় করতেন- আর আল্লাহই অধিক জানেন।'

২— যে ব্যক্তি এ ধরনের কোন গ্রন্থ লিখেন যাতে চোখ বুজে সহীহ -যথীফ সবই সংকলন করেন এবং মনে করেন যে, কিছু শর্তের সাথে যথীফ হাদীস দ্বারা ফাযায়েলে আঘাতে আমল করা যায়- তাঁর উচিত, গ্রন্থের ভূমিকায় সে বিষয়ে (সাধারণকে) সতর্ক করা এবং ঐ শর্তাবলী উল্লেখ করে (সেই অনুযায়ী) আমল করতে সাবধান করা। যাতে পাঠকগুলি অজানে গ্রন্থে উল্লিখিত প্রত্যেক হাদীসের উপর আমল এবং মুবাল্লেগণ এই গ্রন্থ শুনিয়ে সকলকে আমল করার তাকীদ না করে বসে। ফলে সকলের অজানেই সকলে রসূলের বিরোধিতায় আলিঙ্গ না হয়ে পড়ে।

সুতরাং ঐ শর্তগুলিকে জানা একান্ত জরুরী- বিশেষ করে তাদের জন্য যারা ফাযায়েলে যথীফকে ব্যবহার করে থাকে। যাতে যে কেউ ধৰ্মস হবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট জানার পর ধৰ্মস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট জানার পর জীবিত থাকে।

হাফেয সাখাবী ‘আল কওলুল বাদী’ (১৯৫৪)তে তার ওস্তাদ হাফেয ইবনে হাজার থেকে ঐ শর্তগুলি নকল করেছেন এবং তা নিম্নরূপ :-

১— হাদীস যেন খুব বেশী যথীফ না হয়। অথবা তার বর্ণনাসূত্রে যেন কোন মিথ্যাবাদী, মিথ্যায় কলন্ধিত বা অভিযুক্ত এবং মারাত্মক ত্রুটি করে এমন ব্যক্তি না থাকে।

২— তা যেন ‘সাধারণ ভিত্তির’ অর্থভূক্ত হয়। অর্থাৎ একেবারে ভিত্তিহীন গড়া বা জাল হাদীস না হয়।

৩— এ হাদীস দ্বারা আমল করার সময় যেন তা প্রমাণিত (বা শুন্দ) হাদীস বলে বিশ্বাস না রাখা হয়। যাতে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের সহিত সেই সম্পর্ক না জোড়া হয় যা তিনি বলেন নি।

অতঃপর তিনি বলেন, শেষোক্ত শর্ত দুটি ইবনে আবুস সালাম ও ইবনে দাকীকুল সৈদ হতে বর্ণিত এবং প্রথমোক্তের জন্য আলাই বলেন, ‘তা সর্ববাদিসম্মত।’

ইবনে হাজার (রঃ) তাঁর পুস্তিকা ‘তাবয়ীনুল আজব’ এ বলেন, ‘আহলে ইলমগণ ফাযায়েলে যথীফ হাদীস ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছেন- যদি তা গড়া না হয় বা খুব বেশী যথীফ না হয়- এ কথাটি প্রসিদ্ধ। কিন্তু এর সহিত এই শর্তও আরোপ করা উচিত যে, আমলকারী যেন ঐ হাদীসটিকে যথীফ বলেই বিশ্বাস রাখে

(শুন্দ মনে না করে) এবং তা যেন প্রচার না করে। যাতে কেউ যেন যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করে যা শরীয়ত নয় তাকে শরীয়ত করে না বসে অথবা কোন জাহেল তাকে আমল করতে দেখে তা সহীহ সুন্নত মনে না করে বসে।

এ বিষয়ে আবু মুহাম্মদ ইবনে আব্দুস সালাম প্রভৃতি ওলামাগণ বিবৃতি দিয়েছেন। যাতে মানুষ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সেই বাণীর পর্যায় ভূক্ত না হয়ে পড়ে যাতে তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি আমার তরফ থেকে কোন এমন হাদীস বর্ণনা করে যাব বিষয়ে সে মনে করে যে তা মিথ্যা, তাহলে সে (বর্ণনা কারী) মিথ্যাবাদীদের একজন।”

সুতরাং যে আমল করবে তার অবস্থা কি ? পক্ষান্তরে আহকাম অথবা ফাযায়েলে (যয়ীফ) হাদীস দ্বারা আমল করায় কোন পার্থক্য নেই। (অর্থাৎযদি যয়ীফ হাদীস দ্বারা আহকাম বা হালাল ও হারামে আমল না চলে তবে ফাযায়েলেও চলবে না) কারণ (উভয়ের) সবটাই শরীয়ত।’

আল্লামা আলবানী বলেন, ‘এই সমস্ত শর্তাবলী খুবই সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ। যদি যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমলকারীরা এর অনুগামী হয় তাহলে তার ফল এই হবে যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমলের সীমা সংকীর্ণ হবে। অথবা মূলেই আমল প্রতিহত হবে এর বিবরণ তিনভাবে দেওয়া যায় :-

প্রথমতঃ প্রথম শর্তটি নির্দেশ করে যে, যে হাদীসকে ভিত্তি করে আমল করার ইচ্ছা হবে সেই হাদীসটির প্রকৃত অবস্থা জানা ওয়াজেব। যাতে বেশী যয়ীফ হলে তার দ্বারা আমল করা থেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে। কিন্তু প্রত্যেক হাদীসের উপর এই জ্ঞান লাভ জনসাধারণের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য। যেহেতু হাদীস শাস্ত্র বিদ্য ওলামার সংখ্যা নেহাতই কম, বিশেষ করে বর্তমান যুগে। অর্থাৎ (সেই ওলামার সংখ্যা নগণ্য) যাঁরা তথ্যানুসন্ধানকারী (সমস্ত হাদীসের সত্যাসত্য যাচাইকারী) ও সমীক্ষকারী হাদীস বিশারদ, যাঁরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হতে শুন্দ প্রতিপাদিত হাদীস ব্যতীত লোকদের জন্য অন্য কোন হাদীস পরিবেশন ও বর্ণনা করেন না এবং যয়ীফ (তথা তার নিয়মান্বের) হাদীসের উপর সকলকে সতর্ক ও সাবধান করে থাকেন। বরং এই গ্রন্থের ওলামা অল্লের চেয়ে কম। সুতরাং আল্লাহই সাহায্যস্থল।

এরই কারণে দেখবেন, যারা যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমলে আপদগ্রস্ত হয়েছে তারা এই শর্তের স্পষ্ট বিরোধিতা করে। তাদের কেউ-যদিও বা সে অহাদীসের আলেম হয়-ফায়েলে আমলে কোন হাদীস জানা মাত্রই তা অধিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত কিনা তা না জেনেই তার উপর আমল করায় ত্বরান্বিত হয়। এরপর যদি কেউ তাকে এ হাদীসের দুর্বলতার উপর সতর্ক করে তবে শীঘ্ৰ এ তথাকথিত ‘কায়দার’ শরণপন্থ হয়;

“ফায়ায়েলে আমলে যয়ীফ হাদীস ব্যবহার করা যায়।” পুনশ যখন এই শর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তখন উত্তর না দিয়ে চূপ থেকে যায়।’

এবিষয়ে আল্লামা দুটি উদাহরণ পেশ করেন :

১- “সর্বোৎকৃষ্ট দিন আরাফার দিন, যদি জুমআর দিনের মুতাবেক হয় তবে তা সত্ত্বে হজ্জ অপেক্ষা উত্তম।” (রায়ীন)

এ হাদীসটির প্রসঙ্গে আল্লামা শায়খ আলী আল-কারী বলেন, ‘কিছু মুহাদ্দেসীন বলেন যে, এই হাদীসের ইসনাদটি যয়ীফ, তা সঠিক মানা গেলেও উদ্দেশ্যে কোন ক্ষতি হয় না। যেহেতু যয়ীফ হাদীস ফায়ায়েলে আমলে গৃহণীয় এবং আল্লামা আবুল হাসানাত লখনবী এই কথা নকল করে বহাল করেছেন। (আল আজবিবাতুল ফাযেলাহ ৩৭পঃ)

কিন্তু ভাববার বিষয় যে, কি রূপে এই শুন্দাভাজন আলেমদ্বয় উপর্যুক্ত শর্ত লংঘন করেছেন। অথবা নিচ্য তাঁরা এই হাদীসের সনদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। থাকলে অবশ্যই তা বিবৃত করতেন এবং তার পরিবর্তে বিতর্ক ছলে “তা মানা গেলেও” -এই কথা বলতেন না। অথচ আল্লামা ইবনুল কাইয়েম ঐ হাদীস প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেন, “বাতিল, রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হতে ওর কোন ভিত্তি নেই, আর না কোন সাহাবী বা তাবেয়ী হতে।” (যাদুল মাআদ ১/১৭)

২- “যখন তোমরা হাদীস লিখবে তখন তোমরা তার সনদ সহ লিখ। যদি তা সত্য হয় তা হলে তোমরা সওয়াবের অংশীদার হবে এবং যদি তা বাতিল হয় তা হলে তার পাপ তার (বর্ণনাকারীর) হবে।” (আল আজবিবাতুল ফাযেলাহঃ ২৬ পঃ)

এই হাদীসটি মওয়ু (গড়া হাদীস) (দেখুন সিলসিলাতু আহাদীসিয় যয়ীফাহ অল-মওয়ুয়াহ ৮২২নং) এতদসত্ত্বেও শুন্দেহে লখনবী সাহেবের এর উপর চূপ থেকেছেন। কারণ, এটাও ফায়ায়েলে আমল তাই ! অথচ এটি এমন একটি হাদীস যা যয়ীফ ও জাল হাদীস প্রচার করতে ও তার উপর আমল করতে সকলকে অনুপ্রাণিত করে। যার মমার্থ হচ্ছে নকলকারীর কোন পাপ নেই, অথচ এমন ধারণা আহলে ইলমদের নীতির পরিপন্থী। যেহেতু তাঁদের নীতি এই যে, গড়ার কথা বিবৃত না করে কোন গড়া হাদীস বর্ণনা করাই জায়েয নয়। তদনুরূপ যথার্থতা যাচাইকারী সংস্কারক ওলামা যেমন ইবনে হিবান প্রভৃতি-গণের নিকট যয়ীফ হাদীসও (তার দুর্বলতা উল্লেখ না করে বর্ণনা করা বৈধ নয়)।

আল্লামা আহমদ শাকের উপর্যুক্ত তিনটি শর্তাবলী উল্লেখ করার পর বলেন, ‘আমি মনে করি যে, দুর্বল হাদীসের দুর্বলতা উল্লেখ করা সর্বাবস্থায় ওয়াজেব। কারণ,

তা উল্লেখ না করলে পাঠক অথবা শ্রোতার ধারণা হয় যে, তা সহীহ বিশেষ করে, নকলকারী অথবা বর্ণনাকারী যদি ওলামায়ে হাদীসের মধ্যে কেউ হন (অথবা দ্বীনের বুর্যুর্গ হন ও সমাজে মান্য হন) যাঁর প্রতি সকলে হাদীস বিষয়ে ঝঁজু করে। যেহেতু যয়ীফ হাদীস গ্রহণ না করায় আহকামে ও ফাযায়েলে আ'মাল ইত্যাদির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বরং সহীহ বা হাসান হাদীস যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম থেকে শুন্দরভে প্রমাণিত হয়েছে তা ব্যতীত কোন কিছুতে কারো হজ্জত বা দলীল নেই।' (মুখ্তাসার আল-বায়েসুল হাদীস ১০১গঃ)

আল্লামা আলবানী বলেন, 'সার কথা এই যে, এই শর্তের পালন কার্যতঃ যে হাদীস (শুন্দ বা সহীহ বলে) প্রতিপাদিত নয় সেই হাদীস দ্বারা আমল ত্যাগ করতে বাধ্য করে। কারণ, সাধারণ মানুষের পক্ষে (যয়ীফ বা দুর্বল হাদীসের) 'অধিক দুর্বলতা জানা (ও চিহ্নিত করা) কঠিন। ফলতঃ এই শর্তাবলোপ করার অর্থ ও উদ্দেশ্যের সহিত যা আমরা এখতিয়ার করেছি তার প্রায় মিল রয়েছে এবং সেটাই উদ্দিষ্ট।

দ্বিতীয়ত : দ্বিতীয় শর্ত থেকে একথাই বুঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে আমল যয়ীফ হাদীস দ্বারা নয়, বরং 'সাধারণ ভিত্তি' দ্বারাই হয়। পরন্তু 'সাধারণ ভিত্তির' উপর আমল তো হয়েই থাকে, তাতে যয়ীফ হাদীস পাওয়া যায় অথবা না যায়। কিন্তু তার বিপরীত হয় না, অর্থাৎ 'সাধারণ ভিত্তি' না থাকলে (কুরআন বা সহীহ সুন্নাহ হতে ঐ আমলের মূল বুনিয়াদ না থাকলে) যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল হয় না। অতএব এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, এই শর্তের সহিত যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা আপাতদৃষ্ট, বস্তুতঃ নয়। আর সেটাই অভীষ্ট।

তৃতীয়তঃ তৃতীয় শর্তটি হাদীসের দুর্বলতা জানা জরুরী হওয়ার ব্যাপারে প্রথম শর্তেরই অনুরূপ। যাতে আমলকারী তা (সহীহ) প্রমাণিত বলে বিশ্বাস না করে বসে। অথচ বিদিত যে, যারা ফাযায়েলে যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি করে আমল করে তাদের অধিকাংশই হাদীসের দুর্বলতা চেনে না। আর এটা উদ্দেশ্যের বিপরীত।

পরিশেষে স্থুল কথা এই যে, আমরা প্রাচ ও প্রতীচ্যের মুসলিম জন সাধারণকে উপদেশ করি যে, তাঁরা যেন যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা আদপেই ত্যাগ করেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম থেকে প্রমাণিত (সহীহ বা হাসান) হাদীস দ্বারা আমল করতে উদ্যোগী হন। যেহেতু তাতেই যা আছে যয়ীফ হাদীস থেকে অমুখাপেক্ষী করে। (আমলের জন্য তাই যথেষ্ট।) এবং ওটাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর মিথ্যা বলায় আপত্তিত হওয়া (ও নিজের ঠিকনা জাহান্নাম করে নেওয়া) থেকে বাঁচার পথ। কারণ, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় জানি যে, যারা এ বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করে তারা উক্ত মিথ্যাবাদিতায় সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। যেহেতু তারা প্রত্যেক সবল দুর্বল (এবং জাল ও গড়া) হাদীস

(এবং অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কেছা-কাহিনীকে হাদীস ধারণা করে তার দ্বারা) আমল করে থাকে। অর্থ নবী সাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (এর প্রতি ইঙ্গিত করে) বলেন, “মানুষের মিথ্যাবাদিতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে (অনুরূপ ভাবে যা পড়ে) তার সবটাই বর্ণনা করে।” (মুসলিম)

এবং এর উপরেই বলি, মানুষের ভ্রষ্টতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে (বা পড়ে) তার সবটার উপরেই (বিচার-বিবেক না করে) আমল করে।

(যেহেতু চক্চক করলেই সোনা হয় না।) (দ্রষ্টব্য : সহীহল জামেইস সগীর, ভূমিকা ৪৯ - ৫৬ পৃঃ এবং তামামুল মিন্নাহ, ভূমিকা ।)

বিদআত ও বিদআতীর পরিণাম

১-বিদআত কুফরীর ডাকঘর। বিদআতীদের বহু ফির্কা তাদের বিদআতের মাধ্যমে কুফরে পৌছে কাফের হয়ে গেছে। যদিও বা তারা নিজেদের পরিচয় মুসলিম বলেই দিয়ে থাকে। যেমন ‘কামেল পীর বা দরবেশ’ দের উপর থেকে শরয়ী বন্ধন তুলে নেওয়া, তাদেরকে আল্লাহর কিছু বৈশিষ্ট্যে (যেমন গায়ের জানা, মসীবত দূর করা, স্বান্দন দান করা প্রভৃতির ব্যাপারে) শরীর করা, তাদের কবর সিজদা করা বা তওয়াফ করা। কৰীরা গোনাহকারী মুসলিমকে কাফের জ্ঞান করা ইত্যাদি।

যারা কিছু আমল ও ইবাদত তো করে কিন্তু ঐ রূপ বিদআতের পাশে তার কোনই মূল্য নেই। আল্লাহপাক বলেন :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْنَاهُمْ سَكِيرٌ
 بِقِيمَةِ حَسَبِهِ الظَّمَانُ مَأْتَى حَقَّهُ إِذَا جَاءَهُمْ وَلَيَعْلَمُنَّ شَيْئًا
 وَرَجَدَ اللَّهُ عِنْدَ مَوْقِفِهِ حَسَابٌ بِمَا لَمْ يَرْكَابْ

অর্থাৎ, “যারা কুফরী করে (সত্য প্রত্যাখ্যান করে) তাদের কর্ম মরুভূমির মরাচিকার ন্যায়, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখে তা কিছুই নয়” (সূরা নূর ৩৯)

২- বিদআতীরা আল্লাহর উপর বিনা ইলমে অনুমান প্রস্তুত কথা বলে। সাধারণতঃ বাতেনী ইলমের দাবীদাররা এই রোগের বোগী। যারা কলবে জ্ঞানার্জন করে থাকে, কুরআন হাদীস ও তফসীরের ইলমে কোন প্রকারের অনুরূপ প্রকাশ করে না, সলফের পথ জানার কোন ইচ্ছা রাখেনা। বরং মনগড়া বাতেনী ইলম দ্বারা, সৃষ্টি ও পরিকল্পিত কাশ্ফ দ্বারা এবং ত্রিশ এর অধিক পারা কুরআন (?) দ্বারা ভঙ্গদের মনোরঞ্জন করে থাকে। শরীয়তের উর্ধ্বে থেকে মারেফতীর দাবী করে

সবকাজে ফুর্তি মারে। আর এ সবের মাধ্যমে প্রকৃত ইলম ছাড়াই আল্লাহ ও তদীয় রসূলের উপর হলাহল মিথ্যা বলে। যা বাস্তার জন্য কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ।
(সূরা আ'রাফ ৩৩)

আল্লাহ বলেন :

وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَتِيمِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ
لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٌ يَنِّ

অর্থাৎ, “সে যদি কিছু রচনা করে আমার নামে চালাতে চেষ্টা করত, তবে আমি তাকে কঠোর হস্তে দমন করতাম এবং তার কঠ শিরা কেটে দিতাম, তখন তোমাদের কেউই তাকে রক্ষা করতে পারত না।” (সূরা হাকাহ ৪৪- ৪৭)

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার উপর মিথ্যা বলে সে যেন নিজের ঠিকানা জাহানাম বানিয়ে নেয়।” (বুখারী ও মুসলিম)

অনুরূপ ভাবে শির্ক ও কুফরীর মূলও আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা। যেহেতু মুশরিক অঙ্গভাবেই মনে করে যে, সে যার পৃজা করে সেই মাঝুদ তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে, তাঁর সামীক্ষ্য দান করবে, তাঁর নিকট সুপারিশ করবে এবং অসীলা বা মাধ্যম হয়ে তাঁর নিকট থেকে তার প্রয়োজন মিটাবে। এ সব অমূলক ধারণা তার কল্পনা-প্রস্তুত। তাই প্রত্যেক মুশরিক আল্লাহর উপর মিথ্যা ধারণা ও রচনা করে থাকে। আর এইরূপ ধারণা ও অনুমানই বিদআতীকে বিদআতে উৎসাহিত করে। (মাদারেজুস সালেকীন)

আর “যে ব্যক্তি আল্লাহ সমৃদ্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁর নির্দর্শন সমৃদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করে তার অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কে ?” (সূরা আ'রাফ ৩৭)

৩- বিদআতীরা সুন্নাহ ও আহলে সুন্নাহর প্রতি নিভান্ত বিদ্রেষ ও ঘৃণা পোষণ করে। উল্টভাবে নিজেদেরকে আহলে সুন্নাহ এবং প্রকৃত আহলে সুন্নাহকে ‘কাফের’ ইত্যাদি বলে। “অক্রকার বলে, আলো তুমি নহ ভালো !”

বিদআতীরা আহলে সুন্নাহকে বিভিন্নভাবে অপবাদ দিয়ে মন্দ নামে অভিহিত করেছে। যেমন মক্কার মুরারেবীনরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে কেউ বলেছিল, ‘যাদুকর, কেউ বলেছিল, গণক কেউ বলেছিল, ‘কবি’ কেউ বলেছিল ‘পাগল’ কেউ বলেছিল ‘বিকার গুণ্ট’ আবার কেউ বলেছিল;

মিথ্যারচনাকারী মিথ্যক ইত্যাদি অথচ তিনি এ সব অপবাদ থেকে পরিত্ব ছিলেন।
আল্লাহ বলেছিলেন :

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْآمِقَانَ فَصَلُوا فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَسْبِيلَ

অর্থাৎ, “দেখ, ওরা তোমার জন্য কি উপমা দেয়-ফলে ওরা পথ ভষ্ট হয়ে গেছে
এবং ওরা পথ পাবে না।” (সূরা ইসরাঃ ৪৮)

তদনুরূপ আহলে সুন্নাহ বা সালাফীগণও যাবতীয় অপবাদ থেকে পরিত্ব।
যেহেতু তারা উজ্জ্বল সুন্নাহ, সন্তোষভাজন চরিত, সরল পথ এবং শক্ত, চৃড়াত্ত ও
অকাট্য দলীলের ধারক ও বাহক। আল্লাহ আয়া অজান্না যাদেরকে তাঁর কিতাব ও
ঐশীবাণীর অনুসরণ এবং তাঁর রসূলের চরিতাদর্শের অনুকরণ করার তওফীক ও
প্রেরণা দান করেছেন। যারা তাঁর অনুকরণে মানুষকে সংকৰ্ত্তা ও কাজের নির্দেশ এবং
অসৎ কথা ও কাজে বাধা দান করে থাকে এবং জীবনের প্রতি মুহূর্তে তাঁরই চরিত ও
সুন্নাহর অনুসারী থাকে। যাদের বক্ষ তাঁর প্রেমে এবং তাঁর শরীয়তের ইমামগণ ও
তাঁর উম্মতের ওলামাগণের মহবতে সদা প্রশঞ্চ। আর যারা যে জাতিকে ভালোবাসে
তারা কিয়ামতে তাদেরই সঙ্গী হবে। (এ' তেকাদু আহলিল হাদীস)

৪- পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, বিদআতীদের আমল রহিত। যেহেতু দ্বীন
পূর্ণাঙ্গ এবং যে কাজে কিতাব বা সুন্নাহর কোন নির্দেশ নেই তা করা ভষ্টতা এবং এর
পরিণাম জাহান্নাম। বিদআতীদের নির্বৰ্থক মেহনত এবং বেকার কর্মকাণ্ডের কোন
পারিশ্রমিক, প্রতিদান ও ফল নেই। আল্লাহ জান্না জালালুহ বলেন :

فَلَمْ يَلْتَهِ كُمْ بِالْأَخْسِرِينَ أَعْمَدَ لِلْأَذْيَاءِ **أَلَّذِينَ حَلَّ شَعْبَيْهِمْ فِي الْحَيَاةِ**
أَلَذْتَيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صَنَعًا

অর্থাৎ, “বল, আমি কি তোমাদেরকে তাদের সংবাদ দেব যারা কর্মে
(আমলে) বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ? ওরাই তারা, পাথিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পও হয়,-
যদিও তারা মনে করে যে, তারা সংকর্ম করছে।” (সূরা কাহফ ১০৩, ১০৪)

৫- বিদআতীদের সময় বিগৱীত মুখী হয়ে যায়। জলাতক রোগের মত
কৃপৰুত্তি তাদের শিরা-উপশিরায় স্থানাধিকার করে বসে। ফলে ভালোকে মন্দ এবং
মন্দকে ভালো রূপে দেখে থাকে। বিদআতকে সুন্নাত এবং সুন্নাতকে বিদআত জ্ঞান
করে থাকে। বিদআতীকে ওলী এবং সুন্নীকে ‘কাফের’ ভেবে থাকে। বাউলিয়াকে
আওলিয়া এবং মুত্তাকীন আওলিয়াকে (ইলমের) দেউলিয়া মনে করে। যাদের নিকট
কোন হজ্জত ও দলীল ফলপূর্ণ হয় না। নবীর আদেশ মানতে এবং প্রকৃত
আওলিয়াদের পথ অনুসরণ করতে বললে বলে, ‘তোমাদের নবী ও আওলিয়াদের

প্রতি কোন আদব ও মহৱত নেই।' হাদীস ও আয়াত দ্বারা কুরআনের তফসীর করতে গেলে বলে, 'তোমরা কুরআন বুঝনা, কুরআন মাননা।' প্রায় সব ব্যাপারেই 'উলট বুঝিল রাম।'

৬- যে বিদআত করলে মানুষ কাফের হয়ে যায় সেই বিদআতের বিদআতী এবং তার প্রতি আহবান কারী বিদআতীর রেওয়ায়ত (হাদীসের বর্ণনা) গ্রহণ যোগ্য নয়। যেমন তার সাক্ষিও অগ্রহণযোগ্য।

৭- অধিকাংশ ফিতনার পশ্চাতে কোন না কোন বিদআতীর হাত থাকে এবং বিদআতীরাই বেশীর ভাগ ফিতনায় আপত্তি হয়ে থাকে। তাদের কারণে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এমন ফিতনার সৃষ্টি হয় যাতে বহু মানুষ সন্ধায় মুমিন থাকে সকালে কাফের হয়ে যায় এবং সকালে মুমিন থাকলে সন্ধায় কাফের হয়ে যায়।
সামান্য পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে এরা দ্বীনকে বিক্রয় করে দেয়।

বিদআতই দ্বীন ও সমাজের বড় ফিতনা। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'তোমাদের তখন কি অবস্থা হবে, যখন ফিতনা তোমাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেবে? যাতে বড় বৃদ্ধি হবে এবং ছোট প্রতিপালিত (হয়ে বড়) হবে। মানুষ যাকে সুন্নাহ মনে করবে। যখন তা (ফিতনা বা বিদআত) অপসারিত করা হবে তখন লোকেরা বলবে, 'সুন্নাত অপসারিত হল।' একজন জিঞ্জাসা করল 'হে আবু আব্দুর রহমান ! এরূপ কখন হবে?' তিনি বললেন, 'যখন তোমাদের কারীর সংখ্যা অধিক হবে এবং ফকীহ (অভিজ্ঞ আলেমদের) সংখ্যা কম হবে, তোমাদের নেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং আমানতদারের সংখ্যা কমে যাবে ও আখেরাতের কর্ম দ্বারা দুনিয়ার সম্পদ অন্তর্ভুক্ত করা হবে।' (দারেয়ী ১/৬৪)

ইমাম মালেকের নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, 'হে আবু আব্দুল্লাহ ! কোথেকে এহরাম বাঁধব?' তিনি বললেন, যুলহলাইফা থেকে; যেখান থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এহরাম বেঁধে ছিলেন।' লোকটি বলল, 'আমি মসজিদে (নববী) থেকে এহরাম বাঁধতে ইচ্ছা করছি।' তিনি বললেন, 'এমনটি করো না। লোকটি বলল, 'আমি ইচ্ছা করছি যে, মসজিদে করবের নিকট থেকে এহরাম বাঁধব।' তিনি বললেন, 'এমনটি করো না, কারণ আমি তোমার উপর ফিনার ভয় করি।' লোকটি বলল, 'এটা আবার কোন ফিতনা? এতো কয়েকটা মাইল মাত্র বেশী করব!' তিনি বললেন, 'কোন ফিতনা এর চেয়ে অধিক বড় যে, তুমি মনে কর, তুমি এমন ফয়লতের প্রতি অগ্রগামী হয়েছ যা হতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পিছে থেকে গেছেন ? ! আমি শুনেছি আল্লাহ বলেছেন যে,

অর্থাৎ, “সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় (ফিতনা) অথবা কঠিন শাস্তি (আঘাত) তাদেরকে গ্রাস করবে।” (সূরা নূর ৬৩)

বলাই বাহল্য যে, বিদআতিদের এটাই হচ্ছে মূল বুনিয়াদ। ‘ভাল জিনিস তো। বাড়তি করলে ক্ষতি কি?’ তাদের আকেলে অনুরূপ অতিরঞ্জনে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু ইমাম মালেক (রঃ) বলেন, এই টাই ফিতনা।

৮-বিদআতির নিকট হক ও বাতিলের মাঝে তাল গোল খেয়ে যায়। কখনো বা মস্তবড় গর্হিত কর্ম দেখে চুপ থেকে মৌনসম্মতি জানায় আবার কখনো হোটি বিষয়ে কোমর বেঁধে লড়ে। কখনো সামান্য বিষয়কে বড় এবং বড় বিষয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে। তাই কখনো মুসলিমদের জান ও মালকে হালাল মনে করে তাদেরকে হত্যা করে এবং কখনো মশা মারাও হারাম ভাবে। বিভিন্ন কুসংস্কারাদিকে দ্বীন ভাবে। যাদু ও শয়তানী কর্মকাণ্ডকে কারামত জ্ঞান করে। ফলে তাদের অবস্থা ঠিক বনী ইসরাইলদের মত হয়; যাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَطَلِ وَتَكْشِمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

অর্থাৎ, “তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।” (সূরা বাকারাহ ৪২)

৯- বিদআতী অভিশাপ যোগ্য। তদনুরূপ যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা করে তার উপরেও আল্লাহ, ফিরিশতামণ্ডলী এবং সকল মানুষের অভিশাপ। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলেন, “মদীনার সীর থেকে সওর পর্যন্ত হারাম। যে ব্যক্তি তার মধ্যে কোন অপর্কর্ম করবে বা দুর্ঘটনা ঘটাবে বা নবরচিত কর্ম (বিদআত) করবে অথবা এমন অপর্কর্মকারী বা বিদআতীকে স্থান বা প্রশংস্য দেবে বা সাহায্য করবে তার উপর আল্লাহ, ফিরিশতা মণ্ডলী এবং সমগ্র মানব মণ্ডলীর অভিশাপ। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার নিকট হতে ফরয ও নফল কোন কিছুই গ্রহণ করবেন না।” (বুখারী ও মুসলীম ১৩৬৬)

তিনি আরো বলেন, “আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে গায়রাল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করে, আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে নিজ

পিতামাতাকে অভিসম্পাত করে, আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে কোন দুষ্টকারী বা বিদআতীকে আশ্রয় দেয় এবং আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে ভূমির (জমি-জায়গা) সীমা-চিহ্ন পরিবর্তন করে।” (মুসলিম ১৯৭৮)

১০ - বিদআতী আল্লাহর যিকির হতে মুখ ফিরিয়ে থাকে। আবার যিকির করলেও মনগড়া রচিত যিক্র মুখে আওড়ে থাকে। “ইল-ইল, হ-হ, হাই-হাই” প্রভৃতি অথবীন শব্দ দ্বারা উচ্চস্বরে আজব যিকির টেনে থাকে। বরং এখানেই শেষ নয়; যিকরের সময় তথাকথিত তন্ময়তা ও ভাবাবেগে তারা নিজেদের দেহ আন্দেন্তি করে। কাওয়ালীর সুরে ও ডুগডুগির তালে নাচতে থাকে। বরং নারী-পুরুষ একই কক্ষে এই যিকির হেঁকে থাকে। কখনো বা হজুরের তরফ থেকে এই প্রত্যাদেশ হয়, ‘মনের আলো বড় আলো বাইরের আলো নিভাও রে, মনের পর্দা বড় পর্দা বাইরের পর্দা উঠাও রে।’ অতঃপর ঐ কামেলের মজলিসে অঙ্ককারে বেপর্দায় কি ঘটে তা বলাই বাহল্য ! অবশ্য এতে বিশ্বয়ের কিছু নেই। কারণ ঐ কামেলদের উপর শরীয়তের কোন বাঁধনই অবশিষ্ট থাকে না !!

পক্ষান্তরে অনেক বিদআতীর নিকট তাদের গড়া যিক্র আওড়ানো কুরআন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত যিক্র তো জানেই না। বলতে গেলে ব্যঙ্গ হাসে অথবা মুখ টেরো করে নেয়। যেহেতু ওদের নিকট ‘কিতাবী’ যিকির অপেক্ষা ‘কলবী’ যিকরের ফর্যালত বেশী। তাই কুরআন পঠিত হলে কর্মপাত করে না অথচ ঐ ধরনের যিকির অথবা কাওয়ালী যিক্রের ক্ষেত্রে মন দিয়ে কান লাগিয়ে মাথা হিলিয়ে শুনে ও আওড়ায়। আল্লাহ বলেন :

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ أَقْتَلَتْ فَلَوْبَ الْذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
وَإِذَا ذُكِرَ الْذِينَ مِنْ دُوَّادِعَةٍ إِذَا هُمْ يَسْتَجْبُونَ ﴿٦﴾

অর্থাৎ, “যারা পরকালে বিশ্বাস রাখে না (তাদের সামনে) যখন একক আল্লাহর কথা উল্লেখ করা হয় (বা আল্লাহর যিক্র করা হয়) তখন তাদের অন্তর বিত্তুফায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারো (তাদের উপাস্যদের) উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।” (সূরা যুমার ৪৫)

এরা তো সেই বিদআতী যারা কুরআন ও সুন্নাহর নাম শুনলে স্থান ত্যাগ করার চেষ্টা করে। কুরআন-হাদীস শুনতে এদের মন টক হয়ে যায়। কুরআন ও সুন্নাহর মজলিস ও জলসায় উপস্থিত হয় না। হলেও তাদের প্রবৃত্তির প্রতিকূল কথা শুনে মজলিস ছেড়ে পলায়ন করতে চায়। আল্লাহ বলেন :

فَمَا لَهُمْ عِنَّ الْتَّذْكِيرَةِ مُغَرِّضُينَ ﴿٦﴾ كَأَنَّهُمْ حُمُّرٌ مُّسْتَحْيِرُونَ ﴿٦﴾ فَرَأَتْ
مِنْ قَسْتُورَقَ

অর্থাৎ “ওদের কি হয়েছে যে , ওরা উপদেশ হতে দূরে সরে পড়ে? ওরা যেন ভীত-ত্রস্ত গর্দনদল, যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়ন-পর।”(সূরা মুদ্দাস্সির ৪৯ ৫১)

পরন্তৰ এমন অনেক বিদআতী আছে যারা উচ্চ ও সমস্তের কথনে বা লাউড শিপকারে যিকর হাঁকে। এরা একই সঙ্গে বিদআত করে, রিয়া করে, প্রতিবেশীকে কষ্টদেয় এবং আল্লাহর যিক্র এর প্রতি মানুষের মনকে বীতরাগ করে তুলে। আবার অনেকে ইসলামকে কেবল যিক্র ও খানকার সধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় এবং অন্যান্য ময়দান ও পরিবেশে তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না !

১১ - বিদআতীদের প্রধান চরিত্র সমূহের অন্যতম চরিত্র সত্য গোপন করা। আপন ভক্তদের নিকট কর ন্যায় ও সত্যের অপলাপ ঘটায়, যা প্রকাশ করলে তাদের ভেদ ফাঁস হয়ে যায়। কোন সুর্থের খাতিরে জানা বিষয়কে না জানার ভাব করে অথবা শব্দার্থ গোপন করে অথবা কৃটার্থ বা দুর ব্যাখ্যা করে অথবা মনগড়া অর্থ করে আসল সত্য গোপন করে এবং এই কাজে তারা ঐ কাফেরদের দলে শামিল হয়ে যায় যাদের সমর্পকে আল্লাহ বলেন :

الَّذِينَ عَاهَيْتُمْ أَكْتَسَبْتَ يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْتَأَتْهُمْ قَوْنَ
وَهُمْ لَيَكْتَمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
(١٣)

অর্থাৎ, “যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে (মুহাম্মদ) কে ও তেমনিই চিনে, যেমন তারা তাদের পুত্রদেরকে চেনে; কিন্তু তাদের একদল জেনে শুনে সত্য গোপন করে থাকে।” (সূরা বাকারাহ ১৪৬)

তিনি আরো বলেন :

أَفَتَطْعَمُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فِرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْتَمْعُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ
شُمْ يَعْرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا هُوَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
(٢٦)

অর্থাৎ, “তোমরা কি আশা কর যে, ওরা তোমাদের মত ঈমান আনবে? অথচ ওদের মধ্যে একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করতো এবং বুঝার পর জেনে শুনে তা বিকৃত করত।” (সূরা বাকারাহ ৭৫)

অন্যত্র বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتَمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ آتِيهِنَا سِتَّ وَالْمُتَدَى
مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنْنَا لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ
وَيَلْعَنُهُمُ الْلَّعْنُونَ
(١٣)

অর্থাৎ, “আমি যে সব স্পষ্ট নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, মানুষের জন্য খোলা খুলি ভাবে আমি কিতাবে ব্যক্ত করার পরও যারা ঐ সকল গোপন রাখে, আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ করেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়।” (সূরা বাকারাহ ১৫৯)

আর প্রিয় নবী সাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি কোন জানা ইলম প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয় এবং তা গোপন করে, আল্লাহ কিয়ামতে তার মুখে আগুনের লাগাম দেবেন।” (ইবনে মাজাহ)

বলাই বাহল্য যে, কোন ইলম গোপন করা মুসলিমের জন্য হারাম এবং তার শাস্তি ভয়ানক। অতএব কোন মুক্তাকী ওলী কি করে কি সাহসে কোন ইলম গুপ্ত রাখতে পারেন? যাতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, কোনও ইলম-ধার ইহ-পরকালে মঙ্গলের আশা করা যায়-গুপ্ত নেই। সব ইলমই আমীন নবী সাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম, তাঁর পর তাঁর আমানতদার সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), তাঁদের পর তাবেয়ীন বৃক্ষ (রঃ) এবং তাঁদেরই অনুগামী আউলিয়া ও ইমামগণ প্রকাশ ও প্রচার করে গেছেন। বাতেনী ইলম বলে কিছুনেই, যা আছে তা ভঙ্গামি ও ভ্রষ্টতা। বাতেনীর নাম নিয়ে বোকা মানুষদেরকে ধোকায় ফেলে ওরা নিজেদের বুয়ুর্গী জাহির করে থাকে মাত্র।

১২ - বিদআতের অন্যতম প্রভাব এই যে, বিদআতী তার দ্বারা দ্বীনের সৌন্দর্য বিনষ্ট করে এবং তার অনাবিল রূপে আবিলতা আনে। বিদআতীদের বহুবিধ কুসংস্কার ও কু-আচরণ দেখে ইসলামের শক্তিরা দ্বীনের প্রতি কটাক্ষের সহিত বিদ্রূপ হানে। দরবেশী রূপ, বৈরাগী হয়ে ভিক্ষা বৃত্তি, নয়র-নিয়ামের নামে অসদুপায়ে ভক্তদের অর্থহরণ, গাঁজা ইত্যাদি মাদকদ্রব্য সেবন, প্রভৃতি দেখে সকলের মনে ইসলামের প্রতি বিত্তু জন্মে। ফলে দ্বীনের আসল রূপ চাপা পড়ে যায় এবং ইসলাম গ্রহণ করা হতে অনেক মানুষ দূরে সরে যায়। বরং বহু অজ্ঞ মুসলিমের মনেও ইসলামের প্রতি বিরাগ জন্মে। ফলে বিদআতীরা মানুষের হৃদায়তের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

১৩ - বিদআত মুসলিম জাতির সংহতি ও ঐক্য ধ্বংস করে। সুসংবন্ধ সমাজের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে, এক এক ধরনের অভিনব বিশ্বাস কর্ম বা কর্মসূচিত নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জামাআত বা দল গঠিত হয়। মতানৈক্যের কারণে এক দল অপর দলের প্রতি বিদ্বেশ পূর্ণ মনোভাব রাখে, এক দল অপর দলকে ভ্রষ্ট, কাফের বা বিদআতী ভাবে। প্রতি দলের অনুসারী নিজের দলীয় নীতির পৃষ্ঠ পোষকতা করে এবং বিপক্ষের নীতির প্রতিবাদ করে। ভাবে তার দলই শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, যাদেরকে আল্লাহ মানুষের জন্য নির্বাচিত করেছেন। অঙ্ক পক্ষপাতিত্বের পরিগাম শেষে এই দাঁড়ায় যে, একদল অপর দলের জান মাল হালাল মনে করে। এই অবকাশে কোন ইসলাম দুশ্মন সুবর্ণ-সুযোগ পায়। অগম্য ইসলাম দুর্গের উদ্দেশ্যে এই ছিদ্রপথ ব্যবহার করে এবং ইসলামের অপরাজয়ে শক্তিকে ভিত্তি থেকে মুসলিমদের সাহায্যেই নিক্রিয় করে ফেলতে কৃতার্থ হয়ে যায়। যখন অনন্ত অর্থ ও শক্তি থাকা সঙ্গেও মুসলিমরা পরাভূত হয়ে পড়ে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সত্যই বলেছেনঃ “অনতি দূরে বিজাতিসমূহ তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবন্ধ হবে যেমন ভোজনকারীগণ (একই) ভোজপাত্রের উপর একত্রিত হয়।” একজন বলল, ‘আমরা

কি তখন সংখ্যায় কম থাকব ? হে আল্লাহর রসূল ! তিনি বললেন, “বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে, কিন্তু তোমরা হবে তরঙ্গতাড়িত আবর্জনার ন্যায়। আল্লাহ তোমাদের শক্তির বক্ষ হতে (তোমাদের প্রতি) ভীতি ছিনিয়ে নেবেন এবং তোমাদের হাদয়ে দুর্বলতা প্রক্ষিপ্ত করবেন।” একজন বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল ! ‘সে দুর্বলতা কি ?’ তিনি বললেন, “দুনিয়াকে ভালবাসা এবং মরতে না চাওয়া।” (আবু দাউদ)

সংখ্যায় বেশী থাকলেও অনেকের ফলে দুর্বল রয়ে যাবে। ঘনঘটা মেঘের কোথাও কোথাও বিজলী এবং গর্জন থাকলেও কোন বর্ষণ থাকবে না।

“ভিতরের দিকে যত মরিয়াছি বাহিরের দিকেও তত,
গুনতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু-ছাগলের মত।”

অর্থ বিধান কর্তা মুসলিম জাতিকে সতর্ক করে বলেছেন:

وَأَغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَقْرَفُواْ

অর্থাৎ, “এবং সকলে আল্লাহর রশি (কুরআন ও দ্বীন) কে শক্ত করে ধারণ কর এবং পরম্পর বিছিন্ন হয়ো না।” (সূরা আলে ইমরান ১০৩)

أَنْ أَقِيمُوا الْدِينَ وَلَا تَنْقِرُوهُ فِي

অর্থাৎ, “...তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে (মতভেদ করে) বিছিন্ন হয়ো না।” (সূরা শূরা ১৩)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقْرَفُوا وَأَخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ أَلْبَيْتُ
وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

অর্থাৎ, “এবং তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নির্দর্শন আসার পর (বিভিন্ন দলে) বিভক্ত হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাশান্তি।” (সূরা আলে ইমরান ১০৫)

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِيَنَهُمْ وَكَانُوا شَيْئاً لَّتَسْتَ مُتَّقِمٌ فِي شَرِيعَةٍ إِنَّمَا
أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ شَيْءٌ بَتَّيْهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

অর্থাৎ, “অবশ্যই যারা দ্বীন সমৃদ্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে (হে নবী) তুমি কোন কিছুতে তাদের অভর্তুক নও (এবং তারা ও তোমার দলভূক্ত নয়) তাদের বিষয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত, আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সমৃদ্ধে তাদেরকে অবহিত করবেন।” (সূরা আন আম ১৫৯)

আল্লাহর রসূল সাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামও উম্মতকে সাবধান করে ভবিষ্যতবাণী করেন, “ইয়াহুদ একাত্তর দলে এবং নাসারা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে এবং আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। যার একটি মাত্র দল ছাড়া সবগুলিই জাহান্নামী হবে।” সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘সেই একটি দল কোনটি ? হে আল্লাহর রসূল ! তিনি বললেন, ‘যে দল আজ আমি ও আমার সাহাবাগণ যার উপর আছি তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।’ (আবু দাউদ, তিরমিয়ী)

কিন্তু মূর্খতা ও যুলম সকল মন্দের মূল। এই উভয় হতেই শুরু হয় ভুল বুঝাবুঝি। ফলে অনেকে নিজেকে ত্রুটিহীন মনে করে অথবা নিজের মান্যবরকে অপ্রতিদৰ্শী ভুলমুক্ত জ্ঞানী মনে করে প্রকৃত হক ও সত্য চিনতে ভুল করে বসে এবং শুরু হয় দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্নতা।

১৪ - সমাজকে সাবধান ও সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বিদআতীর গীবত করা বৈধ। যেমন ফাসেক ও প্রকাশ্যে পাপে লিঙ্গ ব্যক্তির সমালোচনা ও চর্চা করা হারাম নয়। বরং প্রয়োজন ক্ষেত্রে তা ওয়াজেব হয়ে পড়ে। যেমন যদি কেউ বিদআতী বা দুষ্কৃতীর সহিত অজান্তে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়তে, তার প্রতিবেশ গ্রহণ করতে, ব্যবসা বা অন্য কোন ব্যবহারিক জীবনে অংশী হতে কারো নিকট পরামর্শ বা খোঁজ-খবর নেয় তবে জানা থাকলে নসীহতের নিয়তে তার নিকট ঐ ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা খুলে বর্ণনা করা ওয়াজেব হবে।

অনুরূপ ভাবে কোন তালেব ইলমকে যদি কেউ কোন বিদআতীর নিকট বসতে বা ইলম শিক্ষা করতে দেখে তবে (হিংসা করে নয় বরং) নসীহতের নিয়তে ঐ তালেবকে সতর্ক করা তার জন্য ওয়াজেব।

বিদআতীর প্রকাশ্যে গীবত করা এবং জনসাধারণকে হশিয়ার করা কেবল ইনসাফের সাথে তার বিদআতের উপরে করতে হবে। অন্য কারণ না থাকলে তার অন্যান্য দোষ-ক্রটি বয়ান করা বৈধ হবে না। যেমন ব্যক্তিগত আক্রোশ মিটাবার উদ্দেশ্যে বা স্বৈর্য কাতর হয়ে অথবা কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে অথবা কোন প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ঐ সুযোগের অপব্যবহার করা আদো বৈধ হবে না।

১৫- বিদআতীদের সাধারণ সুভাব এই যে, তারা পথ ও মত পরিবর্তনের সময় বিদআত থেকে অধিক নিরূপিত প্রতি ধারমান হয়। আল্লাহ তায়ালা তাদের বক্রতার প্রতিদান দেন। যেহেতু কৃতকর্মের প্রকারানুরূপ প্রতিফলই স্মার্ভাবিক। আল্লাহ বলেন :

فَلَمَّا دَرَأْتُمْ أَغْوِيَةَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ

অর্থাৎ, “অতঃপর যখন ওরা বক্রপথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ ওদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন ...” (সুরা সাফ্ফ ৫)

ইয়াহয়া বিন আবী উমর শায়বানী বলেন, ‘বলা হত যে, বিদআতীদের তওবা আল্লাহ অগ্রহ্য করেন এবং বিদআতী অধিকতর মন্দ বিদআতের দিকে স্থানান্তরিত হয়।’

এ প্রসঙ্গেই আওয়াম বিন হাওশাব তাঁর পুত্রের উদ্দেশ্যে বলতেন, হে (বৎস) ঈসা ! তুমি তোমার চিন্ত বিশুদ্ধ কর ও ধন অল্প কর। আল্লাহর কসম ! ঈসাকে বিরুদ্ধাচারী (বিদআতী)দের দলে বসতে দেখার চেয়ে তাকে গানবাদ্য ও মদের মজলিসে বসতে দেখা আমার নিকট (তুলনামূলক ভাবে) অধিকতর পছন্দনীয়।’

কারণ বিদআতী তার বিদআতকে দীন মনে করে এবং দীনকে ধারণ ও মান্য করার মতই বিদআতকে ধারণ ও মান্য করে চলে। আবার কোন কারণ বশতঃ ঐ বিদআত থেকে বহির্গত হলে অন্য কোন বড় বিদআতে প্রবেশ করে। কিন্তু মহাপাপী যারা; যেমন, গান বাদ্যকারী ও শ্রবণকারী মদ্যপায়ী ইত্যাদি তারা নিজ কামবশীভূত। তারা জানে যে, তারা যা করে তা মহাপাপ। কিন্তু তাদের কামপ্রবৃত্তি এবং মন্দকর্ম-প্রবণ আত্মার বশবর্তী হয়ে তা বর্জন করতে সহজে সক্ষম হয় না। সম্ভবতঃ তাদের অবৈধতা-জ্ঞানের ফলে কখনো তা পরিহার করতেও পারে। যেহেতু গোনাহগার মানুষের ক্ষেত্রে তওবা, অনুশোচনা এবং সম্মুলে মন্দ কাজ বর্জন করার অধিক সম্ভাবনা ও আশা থাকে যতটা বিদআতকে ধর্ম জ্ঞানকারী বিদআতীর ক্ষেত্রে থাকে না।

সেই বিদআতীর তওবার কোন আশা থাকে না যার হৃদয়ে বিদআত বদ্ধমূল হয়ে অন্তর্ণলে বড় জায়গা জুড়ে স্থান গ্রহণ করেছে। যার জন্য বিদআতকেই প্রকৃত দীন মনে করে এবং তার প্রতিকূল সব কিছুকে পার্শ্বে বর্জন করে। বিদআতে বিষ্ণ হয়ে অন্ধভাবে তাই পছন্দ করে। যে তা পছন্দ ও গ্রহণ করে তাকে ভালোবাসে এবং যে অপছন্দ ও অগ্রহণযোগ্য মনে করে তাকে মন্দ বাসে ও ঘৃণা করে বরং অনেক ক্ষেত্রে শক্ত মনে করে। তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কল্পে এবং তার বিরোধীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বেপরোয়া লড়াই লড়ে।

যেমন প্রাচীন খাওয়ারেজ বিদআতীরা; যারা বিশ্বাস রাখে যে, যে ব্যক্তি কাবীরা গোনাহ করবে সে কাফের হয়ে চিরস্থায়ী -জাহান্নাম বাসী হবে। যারা কখনো এই বিশ্বাস ও ধারণা হতে বিচ্ছুত হয়নি। (অবশ্য কিছু মানুষ সঠিক পথে ফিরে এসেছিল।) অর্থ তাদের ঐ ধারণার প্রতিকূলে কুরআনী আয়াতে এবং সহীহ হাদীসে স্পষ্ট দলীল রয়েছে। কিন্তু তারা তা পৃষ্ঠপিছে বর্জন করে শরীয়তের বিরোধিতায় অটল থেকেছে।

আল্লাহ বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

অর্থাৎ, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সহিত শির্কের অপরাধ ক্ষমা করেন না, এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন।” (সূরা নিসা ৪৮)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি তওহীদের উপর মৃত্যুবরণ করবে সে জাগ্রাতে প্রবেশ করবে। যদিওবা সে ব্যভিচার ও চুরি করে থাকে এবং এইরূপ তিনিবার পুনঃ পুনঃ বলেছেন।

অনুরূপ আরো বহু দলীলাদির উপর ভিত্তি করে আহলে সুন্নাহ বলে, মহাপাপী আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে, যদি তিনি চান তবে তাকে মার্জনা করবেন, নচেৎ তার পাপ অনুযায়ী পরিমাণ মত শাস্তি প্রদান করবেন এবং তার প্রত্যার্বতন স্থল হবে জাগ্রাত।

আল্লাহ পাক বলেন :

شُلْ إِنْتَ أَنَا بَشِّرُوكُمْ بِمُوْحَسِّنٍ إِلَيْ أَنْتَ إِنَّهُ كُمْ إِنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ

অর্থাৎ, “বল, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য।” (সূরা কাহাফ ১১০) অন্যত্রে তিনি বলেন :

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ

অর্থাৎ, “বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশ মঙ্গলী ও পৃথিবীতে কেউই গায়ব (অদৃশ্য) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।” (সূরা নামল ৬৫)

তিনি আরো বলেন :

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَرَاجِنَّ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ

অর্থাৎ, “(হে মুহাম্মদ) বল, আমি তোমাদেরকে এ কথা বলি না যে, ‘আমার নিকট আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে।’ আর গায়ব (অদৃশ্য) সমৃদ্ধেও আমি অবগত নই।” (সূরা আনআম ৫০)

এই আয়াত সমূহ এবং আরো অন্যান্য আয়াত ও হাদীস শরীফের উপর ভিত্তি করে আহলে সুন্নাহ বলে যে, আল্লাহর নবী মানুষ ছিলেন এবং তিনি গায়ব জানতেন না, গায়বী খবর তিনি ওহীর মাধ্যমে জানতেন ও জানাতেন।

কিন্তু বিদআতীরা ঐ সমস্ত দলীলকে পশ্চাতে ফেলে ভক্তির আতিশয়ে প্রিয় নবী সাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ‘আশরাফুল মখলুকাত’ (সৃষ্টির সেরা জীব) হতে বহিস্থূত করে এবং তাঁর জন্য গায়বীর দাবী করে আল্লাহর আসনে বসাতে দ্বিধা করে না কেউবা তাঁর শরীয়তকে পদদলিত করে ফুর্তি মেরে ‘মারফতী’র দাবী করে অলী সেজে বসে। অথচ অলি হয়ে যে পরিমল আহরণ করে তার সবটাই গরল। হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করে ব্যবহার করে! এবং তারই মাধ্যমে অঙ্গ সাদা মানুষদের মন ও হৃদয় লুটে ফায়দা উঠায়। মরণকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে নয়, যেখানে আল্লাহর রসূল তাঁর নিজের জন্য দুআ ও দরুদ পড়তে বলেছেন, সেখানে ওদের জন্য দুআর উদ্দেশ্যে নয়, পরকালকে স্মরণ করে হৃদয়ে ভয় আনার উদ্দেশ্যে নয়, বরং মৃতের কাছে জীবন চাইতে নিঃস্বের কাছে সম্পদ চাইতে এবং পরকালের দুয়ারে ইহকাল চাইতে কবর যিয়ারত (পূজা), সিজদা, চুম্ন, তওয়াফ, তাৰারুক, উরস ইত্যাদি দ্বারা নতুন শরীয়ত রচিত করে।

মহবতে রসূলের নামে সেই কাজ করে যাতে ওদের খুশীর ভরপুর সমাগম ঘটে। ভিন্ন জাতির অনুকরণে দ্বিনকে কেবল নিজেদের স্বার্থ, আনন্দ ও সুস্বাদ আসুন্দনের উদ্দেশ্যে আংশিক ধারণ করে থাকে। আর নিরানন্দে একটু স্বার্থ ত্যাগ ও কষ্ট সৌকারে ওরা আদৌ মহবতের পরিচয় দেয় না এবং তাবে ঐ অনুষ্ঠানগত মহবতই জরুরী ও যথেষ্ট। বাকী তাঁর আদর্শে চরিত্র গড়া, তাঁর নির্দেশ পালন করা, তিনি যা পছন্দ করেছেন তা পছন্দ করা ইত্যাদি অজরুরী ও ফালতু ভাবে।

পক্ষান্তরে, পার্থিব জীবনে প্রেমের কোন নির্দিষ্ট ধারা নেই, নিয়ন্ত্রিত গতি নেই, হাবিব তার মাহবুবকে যে কোন প্রকারে যে কোন উপায়ে এবং যে কোন মাধ্যমে তার মহবত জানাতে পারে। যাতে কোন বাধা নেই, নিয়ন্ত্রণ নেই এবং সুশঙ্খলতা নেই। কিন্তু বাস্তার জন্য আল্লাহ এবং উম্মতের জন্য রসূল এমন মাহবুব, যিনি কেবল নিয়ন্ত্রিত প্রেমই পছন্দ করেন। কপট, হীন উচ্ছৰ্জন বা স্বার্থের প্রেম আদৌ পছন্দ করেন না। নিয়ন্ত্রণ ও পরিমাণের বাইরে কোন প্রেমের অতিরঞ্জন তাঁর নিকট প্রীত নয়। যেহেতু পার্থিব প্রেমে প্রায়শঃ ক্ষেত্রে হাবীব-মাহবুব উভয়ের মান-মর্যাদা অথবা কোন না কোন দিক সম্পরিমাণ থাকে যাতে উভয়ের মনের উচ্ছ্঵াস গতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ফলে একে অপরকে ইচ্ছামত বলে এবং ইচ্ছামত উপহার দেয় কিন্তু সেই মাহবুব যিনি সৃষ্টি কর্তা, পালন কর্তা, জীবন দাতা, প্রতিটি জীব যাঁর দয়ার মুক্তাপেক্ষী তিনি একমাত্র মাঝুদ এবং সেই মাহবুব যিনি অনুসৃত, যাঁর আদেশ কেউ অমান্য করলে, যাঁর নির্দেশ কেউ লঙ্ঘন করলে জাহান্নামের মহাশি তার উপযুক্ত শাস্তি হয়, যে মাহবুব তাঁকে ভালবাসার উপায় শিক্ষা দিয়েছেন, প্রেমের ধরন বলে দিয়েছেন, যাতে ভালোবাসতে গিয়ে কেউ বেআদবি করে না বসে। এমন মাহবুবের জন্য হাবীবের হৃদয়ে সদা ভয় থাকে যাতে প্রেম নিয়ন্ত্রণ হারা, নিয়ম ছাড়া, বক্ষন হারা ও বেয়াড়া না হয়ে যায়। পার্থিব প্রেমে অতিরঞ্জন চলে, কখনো বা উপহাস ছলে

বেআদবি চলে কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের প্রেমে নিছক আদব, তাঁয়ীম ও আনুগত্য থাকে। তাইতো অযুর অঙ্গ তিনি বারের পরিবর্তে চার অথবা তার অধিক বার ধৌত করা বৈধ নয়। যদিও অধিকবার ধৌত করায় অধিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়। তাইতো আল্লাহর প্রেমে তম্ময় হয়ে ফজরে দুই এর স্থানে চার রাকাআত ফরয পড়া প্রেমিক বান্দার জন্য বৈধ নয়। যেহেতু তাঁর প্রেমের পথ নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত। এই নির্দিষ্ট সীমা দ্বারাই তাঁর প্রকৃত প্রেমের অংশ পরীক্ষা হয়। তাই নির্দেশিত সরল পথ ব্যতীত অন্যান্য বক্ষিম পথে তাঁর মহবত হাসিল হয় না।

পক্ষান্তরে প্রেমিকা কেবল শাড়ির আবেদন জানালে তার সঙ্গে বাড়তি ব্লাউজ ও চুড়ি নিবেদন করলে সে নারাজ হয় না বরং আরো অধিক খুশী হয় এবং প্রেমের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ভৃত্য সারা দিনের কর্তব্য পালন করেও যদি রাত্রে প্রভুর পা পা দাবায় তবে প্রভু খুশী হয়ে তার বেতন বৃদ্ধি করে-নারাজ হয় না।

হ্যাঁ যদি ব্লাউজ ও চুড়ি প্রেমিকার দেহাদের মাপ ও তার পছন্দ মত হয় এবং ভৃত্যের ঐ বাড়তি খিদমত যদি প্রভুর সময় ও পুয়োজন মত হয় তবেই তা সম্ভব। নচেৎ ভালোবাসার ঝুলিতে ভর্তসনাই স্থান পাবে। আবার শাড়ী ব্যতীত অন্য কিছু বাড়তি আনলে এবং কাজ ছেড়ে প্রভুর পা দাবালে কি হবে তা বলাই বাহল্য।

অনুরাগভাবে শরীয়তের পছন্দমত যে সব নফল (বাড়তি) কাজের নির্দেশ আছে তা করলে তো আল্লাহ খুশীই হন কিন্তু তাঁর নির্দেশ ও পছন্দের বাইরে নিজের মনগড়া কিছু করতে চাইলে অবশ্যই বঞ্চনা ও লাঞ্চনা ছাড়া কিছুই লাভ হয় না। আবার তাঁর নির্দেশ অম্বান্য করে অতিরিক্ত অন্য কিছু করে মহবত প্রকাশ করতে চাইলে জাহেল হাবীব এটাই বুঝে যে, সে তার মাহবুব ও শরীয়ত অপেক্ষা অনেক বেশী বুঝে। আবার এটাই বলতে দুঃসাহস করে যে, শরীয়ত তো একটা পিয়াজের মত যার সবটাই খোসা (ছাল) ! অর্থাৎ যার সার ও আসল কিছুই নেই !! শরীয়তের আলেম ও অনুগামীরা তো কেবল পানারী পাতার মত; যা পানির গভীরতার উপরেই ভেসে বেড়ায় ইত্যাদি !!! এধরণের ছন্দছাড়া, বাঁধন হারা মহবতের দাবীদারদের অবস্থা কি হবে তা জ্ঞানীদের নিকট সহজেই প্রতীয়মান।

বিদআতীদের এমন অনেক মানুষ আছে যারা বিদআতকে আন্তর্মূলে স্থান দেয় না, তবে তা ভালো জেনে এবং তাতে আল্লাহ খুশী হবেন এই মনে করে লোকের দেখাদেখি সাধারণ ভাবে তা করে থাকে। কিন্তু তার বিপরীত কোন দলীল বা নীতিকথা শুনলে উদার মনে তা পরিত্যাগ করে প্রকৃত দ্বীনকে হীন সেবক ক্লপে ধরার চেষ্টা করে এবং বিদআত হতে তওবা করে, অবশ্যই তারা পথ প্রাপ্ত এবং তাদের জন্যই মৃত্তি।

বিদআতের নীতিমালা

যে সমস্ত উপায়ে বিদআত চিহ্নিত হয়ে থাকে এবং যে সকল কর্মকে শরীয়তে বিদআত বলে গণ্য করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :—

১- প্রতি সেই কথা, কাজ ও বিশ্বাস-যদিও বা তা ইজতেহাদী হয়-যা সুন্নাহর প্রতিকূল হয় তা বিদআত।

২- প্রতি সেই কর্ম যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভের আশা করা যায় অথচ শরীয়ত তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তা করলে বিদআত করা হয়।

৩- প্রতি সেই বিষয় যা কোন বর্ণনা বা নির্দেশ ব্যতীত বিধেয় হওয়া সন্তুষ্টির নয়, অথচ সে বিষয়ে শরীয়তের কোন বর্ণনা বা নির্দেশ নেই তা বিদআত। অবশ্য কোন সাহারী কর্তৃক কোন ইঙ্গিত বা নির্দেশ থাকলে তা বিদআত বলা যাবে না।

৪- কাফেরদের সেই আচার-অনুষ্ঠান বা প্রথা যা ইসলামে ধর্ম বা ইবাদত রূপে (বা করতে হয় ভেবে) পালন করা হয় তা বিদআত।

৫- যে বিষয়ের মুস্তাহাব হওয়ার উপর কোন ফকির বা আলেম-বিশেষ করে পরবর্তীকালের ওলামাগণ বিবৃতি গেশ করেছেন অথচ তার সৃপক্ষে কোন শরয়ী দলীল নেই, সে বিষয়ও বিদআত।

৬- প্রতি সেই ইবাদত বা আমল যার পদ্ধতি ও প্রণালী যয়ীফ অথবা মওয়ু (গড়া) হাদীস ব্যতীত অন্য কোন সহীহ বা হাসান হাদীসে বর্ণিত হয়নি তা করা বিদআত।

৭- ইবাদতে প্রত্যেক অতিরিক্ত, অতিরঞ্জিত ও বাড়তি কাজই (অর্থাৎ ইবাদতে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করাই) বিদআত।

৮- প্রত্যেক সেই ইবাদত যা শরীয়ত সাধারণ ভাবে পালন করতে উদ্বৃক্ত করেছে কিন্তু মানুষ তাকে কোন স্থান, কাল, গুণ, নিয়ম-পদ্ধতি, সংখ্যা বা কারণ প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা নির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট করে নিয়েছে তা বিদআত। (আহকামুল জানায়ে, আলবানী)

৯- প্রত্যেক সেই আচার, কু প্রথা বা কুসংস্কার যা শরীয়ত সম্মত নয় এবং বিবেক ও জ্ঞান সম্মতও নয়, যা কিছু জাহেল দ্বীন ও করণীয় কর্তব্য মনে করে তা বিদআত। (মানাসেকুল হজ্জ, আলবানী ৪৫৫ঃ)

এই সকল বিদআতের দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হবে।

প্রচলিত কিছু বিদআতের নমুনা

পূর্বে আলোচিত বিদআত সৃষ্টির বিভিন্ন কারণেই মুসলিমদের মাঝে বহু বিদআত ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে। যার কিছু তো কুফর ও মহাপাপ এবং কিছু বিদআত আছে যা করলে সাধারণ বিরুদ্ধাচরণের পাপ করা হয়। সেই প্রচলিত কিছু বিদআতের নমুনা সংক্ষেপে পেশ করা উচিত মনে করছি। অবশ্য শুরুতেই খেয়াল রাখা উচিত যে, উল্লেখিত কর্ম গুলি শরীয়ত বা বিধেয় কর্ম ভেবে করলে তবেই তা বিদয়াত বলে গণ্য হবে, নচেৎ তা সাধারণ ভুল অথবা নিষিদ্ধ কর্ম রূপে বিবেচিত হবে।

কুরআন প্রসঙ্গে যে সমস্ত বিদআত প্রচলিত যেমন, এমন ঢঙে টেনে পড়া যাতে কুরআনের শব্দবিন্যাস বিনষ্ট হয়ে যায়। তেলাওয়াত শেষে ‘সাদাকাল্লাহুল আয়া’ পাঠ। মুর্দার উপর, কবরের উপর কুরআন পাঠ। সেহারীর আয়ানের পরিবর্তে কুরআন পড়ে জাগ্রত করণ। জুমআর দিনে প্রয়োজনে খৃতবার আয়ানের পূর্বে আর এক আয়ান দেওয়ার পরিবর্তে কুরআন (সূরা জুমআহ) পাঠ করে ডাকা হাঁকা।

শব্দীনা পাঠ, কুলখানী, ফাতেহাখানী, আয়াতের নকসা বানিয়ে দেওয়ালে লিখা বা বাঁধিয়ে টাঙ্গানো। মুসহাফ নিয়ে কপালে, চোখে বা বুকে ঠেকানো, স্পর্শ করে গায়ে মাথা, চুম্বন করা। খতমের বাঁধা দুআ।

নবী সাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর যে সব বিদআত আকীদায় এসেছে; যেমন, এই বিশ্বাস করা যে, তিনি মানুষ ছিলেন না তিনি গায়ের জানতেন, তাঁর দেহের ওজন ও ছায়া ছিল না। তাঁর মল-মুক্ত পবিত্র ছিল। তিনি আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি ছিলেন এবং তাঁর নূর থেকে জগৎ সৃষ্টি। তিনি হাযির ও নাযির; তিনি মীলাদ মাহফিলে হাজির হন। তিনি পার্থিব জীবনের ন্যায় জীবিত আছেন। কিছু চাইলে তিনি দিতে পারেন। তাঁর কবর যিয়ারত করলে পাপ ক্ষয় হয় ইত্যাদি।

ওলী-আওলিয়া নিয়ে প্রচলিত বিদআত যেমন, তাঁরা পার্থিব জীবনের ন্যায় জীবিত আছেন মনে করা। তাঁরা আহবানকারী ভক্তের আশা পূর্ণ করতে পারেন, রোগ ও বিপদ মুক্ত করতে পারেন, ধন ও সত্তান দান করতে পারেন। তাঁরা অদৃশ্যের (গায়বী) খবর জানেন ইত্যাদি বিশ্বাস করা, যাতে মানুষ মুশরিক হয়ে যায়। কোন ওলীর ত্যক্ত বস্তুর মাধ্যমে তাৰারুক (বেরকত) গ্রহণ। জীবিত প্রকৃত অথবা কল্পিত ওলির এঁটো বা ব্যবহৃত কোন জিনিস ব্যবহার করে বর্কত ও কল্যাণের আশা করা ইত্যাদি।

মাসজিদ বিষয়ক বিদআত যেমন, মাসজিদ অধিক সৌন্দর্য-খচিত ও রঙচঙে করা। মসজিদে কারো কবর দেওয়া। মাসজিদে সাংসারিক ও বৈষয়িক গল্পগুজব করা। কলরব, অট্টহাসি, ঔবেধ সমালোচনা করা। মাসজিদের দেওয়াল, মিমুর বা ধূলা স্পর্শ করে গায়ে মেথে বর্কত বা আরোগ্য লাভের আশা করা ইত্যাদি।

আয়নের বিদআত যেমন, জুমআর দ্বিতীয় আয়ন মিয়ারের গোড়ায় নিম্নসুরে দেওয়া। আয়নের পর উচ্চরবে দুরদ ও দুআ পাঠ করা। অসীলার দুআয় ‘অদ্দারাজাতুর রাফীআহ’ বৃদ্ধি করা। আয়নের পর পুনরায় নামাযের জন্য আহবান করা। ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মদ.....’শুনে চোখে আঙুল বুলিয়ে তা চুম্বন করা। ‘আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম’ এর উভরে ‘সাদাকতা ওয়া বারারতা’ বলা। ‘কাদকা-মাতিস সালাহ’ শুনে ‘আকামাহলাহ অ আদামাহ’ বলা। আয়নের শেষে হাত তুলে দুআ পড়া।

নামায সম্পর্কিত বিদআত যেমন, ফজরের নামাযে কুনুত, কুনুতের পরিবর্তে ‘কুল’ পাঠ। তকবীরে তাহরীমার সময় হাত তুলে কান স্পর্শ করা। এই সময় উপর দিকে মাথা তুলা। বাঁধা গড়া নিয়ত পড়া। নিয়ত (যে কোন ভাষাতে) মুখে উচ্চারণ করা। সমসুরে উচ্চরবে ‘রাববানা লাকাল হামদ’ বলা। দুই সিজদাহর মাঝের বৈঠকে অনুরূপ ভাবে দুআ পড়া। সালাতুর তাহফীয় (কুরআন হিফ্য সহজে হবে এই নিয়তে বিশিষ্ট) নামায পড়া। সালাতুর তসবীহ জামাআত করে পড়া। মা-বাপের নামে বিশিষ্ট নামায পড়া। শবেবরাতের বিশেষ নামায পড়া। নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়ে বুকে ফুঁক দেওয়া, সালাম ফিরে মাথায় হাত রেখে বিশেষ দুআ পাঠ। শেষ রাকআতের শেষ সিজদাহ লম্বা করা।

জুমআহ সংক্রান্ত বিদআত যেমন, জুমার দিন সফর করতে নেই মনে করা। এই দিনে কোন কাজ করতে নেই ভাবা। জুমআর জন্য পাপ (যেমন দাঁড়ি চাঁচা, সোনা বা রেসম ব্যবহার) দ্বারা সৌন্দর্য ধারণ করা। মাসজিদে মুসাল্লাহ বিছিয়ে স্থান দখল করা। তিন সির্ডির অধিক মিমুর। জুমআর দিন মিমুরকে কাপেটাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা। জুমআহ বা ঈদের নামাজের জন্য বিশেষ করে পাগড়ি বাঁধা। দ্বিতীয় আয়ন মাসজিদের ভিতর খতিবের সামনে দেয়া। প্রথম আয়নের পরিবর্তে কুরআন পাঠ ও ডাকহাঁক। জুমআর (নামায়িদের নামায পড়ার) সময় মসজিদের উচ্চরবে কুরআন পাঠ। জুমআর পূর্বে নির্দিষ্ট রাকআত ‘কাবলাল জুমআহ’ সুন্নত পড়া। খুতবায়ে হাজাহ (আলহামদু লিল্লাহি নাহমাদুহ..) পাঠ বর্জন করা। সুরা কাফ দ্বারা উপদেশ না দেওয়া। সুর করে খোতবা পাঠ। খতিবের ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পাঠ শুনে সকলের উচ্চরবে সমসুরে ঐ কালেমা পাঠ। নবীর নাম শুনে (দুরদ না পড়ে) আঙুল দ্বারা চক্ষু স্পর্শ করে তা চুম্বন করা। দুই খুতবার মাঝে কোন দুআ বা সুরা পাঠ। ইমাম বসা কালে হাত তুলে মুনাজাত। খুতবাহ চলাকালীন তাহিয়াতুল মাসজিদ দুই রাকআত নামায ত্যাগ। দুই খোতবার কোন একটিকে নসীহত থেকে বাদ দেয়া।

(ইসতিসকা ছাড়া) ইমামের হাত তুলে দুআ করা এবং মুক্তাদীদের হাত তুলে আমীন-আমীন বলা। “ইন্নাল্লাহ ইয়া”মুরু বিল আদলে....” আয়াত দ্বারা খোতবা শেষ করা কে অভ্যাস বানানো। খোতবাহ লম্বা ও নামায ছোট ও সংক্ষিপ্ত করা। একই স্থানে বড় মাসজিদ থাকতে হোট মাসজিদে জুমআহ পড়া। কাতার সোজা না হওয়ার পূর্বেই ইমামের নামায শুরু করে দেওয়া। নামাযের পর ‘তাকাব্বালাল্লাহ ...’ বলে মুসাফাহ করা। মাসজিদের গেটে পানি হাতে দাঁড়িয়ে থেকে মুসলিমদের ফুঁক অথবা খুরুর বর্কত নেওয়া ও রোগ মুক্তির আশা রাখা।

তারাবীহতে বিদআত যেমন, মাঝে ও শেষে হাত তুলে জামাআতী দুআ করা ও দরদ পড়া। মাগরেবের মত বিতর পড়া। দুআ কুনুত পড়ার সময় রফএ ইদাইন (অর্থাৎ তাহরীমার মতো কান বরাবর হাত তুলা)। তারাবীহর পর মিষ্টান্ন বিতরণ।

শবে কদরে বিশেষ করে মিষ্টি বিতরণ। কেবল খাওয়া-দাওয়া ও জলসার মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ।

সালামে বিদআত যেমন, দুই হাতে মুসাফাহ করা এবং বুকে হাত ফিরানো। সালামের পরিবর্তে ‘হেলো’ ‘আহলান’, ‘গুডমর্নিং’ ইত্যাদি বলা। সালামের সময় প্রণত হওয়া। বুকে পা স্পর্শ করে সালাম করা। কদমবুসী করা। সিজদা করা (কুফর)।

দুআর প্রচলিত বিদআত যেমন, উচ্চরবে দুআ করা, ফরয নামাযের পর, বিবাহ বন্ধনের পর, ইফতারের পূর্বে, ঈদের নামাযের পর, জানাযার নামাযের পর বা দাফনের পর, জালসার শেষে, দর্শের শেষে একত্রে হাত তুলে দুআ করা ও ‘আমীন-আমীন’ বলা। হাত তুলে দুআর পর মুখে হাত বুলানো বা বুক স্পর্শ করা অথবা হাত চুমা।

সফর ও ভ্রমণের বিদআত, যেমন, সফর মাসে সফর করতে নেই ভাবা।

অনুরূপ জুমআর দিনে সফর না করা। ঘর হতে কেউ সফরে বের হওয়ার পর ঝাড় না দেওয়া। আম্বিয়া ও আওলিয়াদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা।

হজ সংক্রান্ত বিদআত যেমন, তাওয়াকুলের নাম নিয়ে সম্মুল ছাড়া হজ্জে বের হওয়া। হাজীদের নিকট হতে ট্যাঙ্ক নেওয়া। এহরাম বাঁধার সময় বিশিষ্ট নামায পড়া। এহরাম বাঁধার পর থেকেই সর্বী ইয়তেবা (ডান কাঁধ বের) করে রাখা। মাসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মাসজিদের যিয়ারত করা। বিভিন্ন পাহাড় যেমন, গারে হিরা, সওর প্রভৃতি ভ্রমণে বর্কতের আশা করা। মাসজিদে আয়েশা (বা অন্যান্য মাসজিদে) সওয়াবের উদ্দেশ্যে নামায পড়তে যাওয়া। হজ বা ওমরাহ কারীর কা'বার মাসজিদে প্রবেশ করে তওয়াফ না করে তাহিয়াতুল মাসজিদ পড়া। নামাযে

হাত তুলার মত হাত তুলে হাজরে আসওয়াদের প্রতি ইশারা করা। পাথর চুম্বনের জন্য ভিঁড় করা। চুম্বনের সময় “আল্লাহম্মা ঈমানাম বিকা” দুআ পড়া। চুম্বন করার জন্য নামায পড়ে (ইমামের সালাম ফিরার পূর্বেই)সালাম ফিরে ছুটে পাথরের নিকট যাওয়া। রুকনে ইয়ামানী চুম্বন করা এবং স্পর্শ করতে না পারলে ইশারা করা। স্পর্শের সময় বিশিষ্ট দুআ পড়া। কাবার রুকনে শামী বা অন্যান্য দেওয়াল গেলাফ, মাকামে ইবরাহীম স্পর্শ করে তাবারুক। কাবার দরজার বিপরীত দিকে দেওয়ালের এক উচুঁ জায়গা ‘উরওয়া বুসক’ ধরে তাবারুক গ্রহণ, বৃষ্টি হলে অতিরিক্ত সওয়াব বা বর্কতের আশায় তওয়াফ করা। মীয়াবের পানি গায়ে মেখে তাবারুক গ্রহণ। যময়ের পানি দ্বারা গোসল। বর্কতের আশায় যময়ের পানিতে টাকা পয়সা ভিজানো। যময় পানি পান করার সময় কেবলা মুখ করে বিশিষ্ট দুআ পাঠ। তওয়াফ ও সাইতে প্রতি চক্রে বিশিষ্ট দুআ পড়া।

আরাফায় নির্দিষ্ট দুআ পড়া। জাবালে রহমতে চড়া, মুয়দালিফায় পৌছে প্রথমে নামায আদায় না করে পাথর সংগ্রহ করা। মুয়দালিফায় রাত্রি জাগরণ করা। মুয়দালিফ থেকে পাথর নেওয়া সুন্নত বা জরুরী ভাবা, পাথর মারার পূর্বে পাথর ধৌত করা। পাথর মারার সময় তকবীর পড়ার সাথে অন্যান্য দুআ (যেমন ‘রাজমাল লিশশায়াত্তীন’ ইত্যাদি) পড়া। পাথর মারার জন্য হাত বা আঙুলের নির্দিষ্ট আকার বা ভঙ্গিমা করা। পাথর মেরে জুতা ইত্যাদি মারা।

কুরবানী না করে তার মূল্য সদকাহ করা। হাজীর বাম দিক হতে মাথার চুল কামানো। কিছু নেড়া করে কিছু পরে নেড়া করার জন্য চৈতন রাখার মত কিছু চুল ছেড়ে রাখা। নেড়া করার সময় কেবলা মুখ করা, এই সময় বিশিষ্ট দুআ পড়া।

যে হজ্জের ফরয আদায় করে আসে তাকে ‘হাজী’, ‘আলহাজ্জ’ বলা। তওয়াফে বিদার পর মাসজিদ থেকে উল্টা পায়ে বের হওয়া। একই সফরে বার বার ওমরা করা। মক্কার মাটি বর্কতের আশায় সঙ্গে আনা।

দরদে বিদআত যেমন, বাঁধাগড়া দরদ পাঠ, দরদ পড়তে কিয়াম করা, সমস্তেরে উচ্চরবে দরদ পড়া।

যিকিরের প্রচলিত বিদআহ যেমন, জামাআতি যিকির, শরীয়তে নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট সংখ্যায় যিকির ছাড়া নিজের তরফ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যায় যিকির করা।’ হ-হ বা হয়া-হয়া’ অথবা কেবল ‘আল্লাহ-আল্লাহ’ করে যিকির করা। কলেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাহ’ কে ভেঙ্গে যিকির করা; অর্থাৎ নির্দিষ্ট সংখ্যায় ‘লা ইলাহা’ বলা এবং পরে আবার নির্দিষ্ট সংখ্যায় ‘ইল্লাল্লাহ’ বলা বা ‘ইল-ইল’ বলে যিকির হাঁকা। ‘ইয়া মুহাম্মদ’ বা ‘ইয়া আলী’র যিকির হাঁকা। উচ্চস্তুরে যিকির, হেলে -দুলে যিকির, নেচে, হাততালি

দিয়ে যিকর। কোন ওলীর নামে যিকর। তসবীহ দানা ব্যবহার (যাতে রিয়া হবারও আশঙ্কা থাকে)। কিছু (চিঠি) লিখার পূর্বে বিসমিল্লাহর পরিবর্তে ‘এলাহি ভরসা’ ইত্যাদি লিখা অথবা ৭৮৬ লিখা।

অযুর মধ্যে বিদআতযেমন, গর্দান মাসাহ। অযুর পর আকাশের দিকে তাকিয়ে ইন্না আনযালনা বা অন্য কোন স্রো পাঠ। প্রত্যেক অঙ্গ ধোতের সময় এক এক নির্দিষ্ট দুআ। গোসল করার (ডুব দেওয়ার) সময় কেবলা মুখ করা। গোসল (ডুব দেওয়ার) পর বাঁধা হিয়ালি পড়া।

মৃত্যু ও জানায়ায় বিভিন্ন বিদআত যেমন, মরণাপন্ন ব্যক্তির শিথানে কুরআন শরীফ রাখা, সূরা ইয়াসিন পড়া, মুর্মুরুকে কেবলামুখে করা। নবী ও আহলে বায়তের ইমামগণের নাম নিয়ে ‘তালকীন’ করা। তার নিকট হতে খ্তুবতী, অপবিত্র প্রসূতি ও অন্যান্য অপবিত্র মানুষদিগকে দূর করা। রাতে মৃত্যুক্তির পাশে সকাল পর্যন্ত (কোন ভয়ে) বাতি রাখা। মৃত ব্যক্তির নিকট (গোসল না দেওয়া পর্যন্ত) কুরআন পড়া। ধূপ ইত্যাদি দিয়ে (অপ্রয়োজনে) সুগন্ধময় করে রাখা। দাফন না হওয়া পর্যন্ত মরা ঘরের কোন মানুষের পানাহার না করা। মৃত্যুর খবর ব্যাপক ভাবে (যেমন মাইক ও পত্রিকায়) প্রচার করা। (অবশ্য আশেপাশের লোককে মৃত্যুর খবর জানিয়ে জানায়ার প্রস্তুতির কথা বলা দোষগীয় নয়)। মৃত্যুক্তির তাহারতের (পবিত্রতার) জন্য ব্যবহাত খিরকা (বস্ত্র খণ্ড) ইত্যাদি দূরে ফেলতে গিয়ে (কোন বিপদের আশঙ্কায়) সঙ্গে লোহা রাখা।

গোসল দেওয়ার সময় প্রত্যেক অঙ্গে পানি ঢালার সময় বার বার ‘লা ইলাহা ইলাল্লাহ’ বা অন্য যিকর অথবা বাংলায় কোন বাঁধা হিয়ালি পড়া। লাশ উঠানো ও নামানোর সময় এবং পথে নিয়ে যাবার সময় উচ্চসুরে সকলের ‘লা ইলাহা ইলাল্লাহ’র যিকর।

মহিলার চুল চুটি না গেঁথে বুকের উপর খোলা ফেলে রাখা। বর্কতের আশায় বা আয়াব মাফ হওয়ার আশায় কোন পীর বা ওলীর-সুপারিশ নামা (!) বা শাজারানামা অথবা অন্য কিছু আয়াত বা দুআ কাফনের ভিতরে রাখা ! কোন ওলীর কবরের পাশে কবর দেওয়ার জন্য দূর থেকে লাশ বহন করা। বাড়তি কাফন ইত্যাদি ব্যবহার করতে ভয় করা।

এই বিশ্বাস রাখা যে, মুর্দারা সকলে নিজ নিজ সুন্দর কাফন নিয়ে গর্ব করে। কাফনের উপর কোন আয়াত বা দুআ লিখা। জানায়ার খাটকে ফুল ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত করা। সৌন্দর্য খচিত বা কালেমা অথবা আয়াত লিখিত মখমলের চাদর দ্বারা লাশ ঢাকা। লাশের উপর বা কবরের উপর ফুল দেওয়া। পুষ্পমাল্য দ্বারা শুদ্ধাঙ্গলি দেওয়া। জানায়ার সাথে পতাকা বহণ করা। কোন খাদ্যদ্রব্য বা পয়সা ছিটানো।

এই বিশ্বাস রাখা যে, মৃত ব্যক্তি নেক হলে তার লাশ হাঙ্কা হয়। জানায়া বের হওয়ার সাথে সাথে সদকা করা। চল্লিশ কদম মাত্র জানায়া বহন করে নির্দিষ্ট সওয়াবের আশা করা। লাশ নিয়ে ধীরে চলা। লাশের উপর ভিঁড় জমানো। কোন বিশ্বাসে জানায়ার নিকটবর্তী বা সম্মুখবর্তী না হওয়া নীরবতা ত্যাগ করা। আপোসে তর্কাতর্কি ও বচসা করা। জানায়া সহ কোন ওল্লীর কবর তোয়াফ করা। মৃতের উপর জানায়া পড়া হয়েছে তা জানা সত্ত্বেও পুনরায় গায়েবানা জানায়া পড়া। জানায়ার নামাযের কাতারে গোলাপ পানি ছিটানো। জুতার ময়লা নেই একীন সত্ত্বেও জানায়ার নামাযের জন্য জুতা খুলে ফেলা অথবা খুলে তার উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়া। নামাযে দুআ ইস্তেফতাহ পড়া। সূরা ফাতেহা সহ অন্য একটি সূরা পাঠ ত্যাগ করা। নামায শেষে হাত তুলে জামায়াতি দুআ করা। দাফন করার সময় যিক্রি জোরে-শোরে পড়া। মাথার দিক থেকে লাশ নামানো। মুর্দার জন্য কবরে বালিশ তৈরী করা। কবরকে সুগন্ধিত করা। মাটি দেবার সময় ‘মিনহা খালাকনাকুম’ আয়াত পড়া। (কবরে যে লাশ রাখে সে ছাড়া) সকলের ‘বিসমিল্লাহি অআলা মিল্লাতি রসূলিল্লাহ’ দুআ পড়া। লাশের বুকে মাটি রাখা। কবর এক বিদ্যার অধিক উচু করা। কবরের চার কোণে ও মাঝে খেজুর ডাল গাড়া। (অবশ্য পশুর নষ্ট করা থেকে বাঁচাতে কঁটা ইত্যাদি রাখা দোষনীয় নয়।) কবর লোয়ানো। (অবশ্য ‘লহন’ কবরে শুষ্ক মাটিকে ভিজিয়ে বসানোর জন্য পানি ঢালা উত্তম।) এই সময় সকলের ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়া। দাফন শেষে হাত তুলে সকলে মিলে মৃতের জন্য জামাআতি ইস্তেগফার করা। পাশে কোন আয়াত বা দুআ দরদ পড়া। মাথার দিকে সূরা ফাতেহা বা সূরা বাকারার প্রথমাংশ এবং পায়ের দিকে সূরা বাকারার শেষাংশ পাঠ করা। দাফনের পর তালকীন দেওয়া। কবরের পাশেই মাটির পাত্র (ব্যবহার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও) ছেড়ে আসা। বিশ্বাস রাখা যে, কবরের মাটি বাড়লে হালে আবার কেউ মরবে !

দাফনের পর কবরের পাশে বাস করা ও (পাহারা দেওয়া। অবশ্য লাশের কোন অঙ্গ অথবা কাফন ছুরি হওয়ার আশঙ্কায় পাহারা দিলে ভিন্ন কথা।) আমাবশ্যার রাতে মরা খারাপ বা অশুভ মনে করা। দাফন করা থেকে ফিরে এসে হাত-মুখ না ধুয়ে বাড়ি প্রবেশ করতে বা কাউকে স্পর্শ করতে নাই ভাবা। কবরের পাশে কোন খাদ্য বিতরণ বা পশু যবেহ। মরা ঘরের যিয়াফত গ্রহণ করা। মরা ঘরে ভোজ করা। (আত্মীয় বা প্রতিবেশীর কেউ না খাওয়ালে সাধারণ ভাবে দূরের কুটুম্বদেরকে খাওয়ানো দোষের নয়।) মরা ঘরের আত্মীয় সৃজনকে দেখা করার জন্য এবং সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে তাদের গৃহে জমায়েত হওয়া ও এর জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট করা।

কেবল শোকপালনের উদ্দেশ্যে দাঢ়ি-গোপ লম্বা করা। অভ্যাসমত ভালো খাওয়া ত্যাগ করা। (মৃত্যুক্তির স্তৰী ব্যক্তি) অন্য কারো শোক পালনের উদ্দেশ্যে সৌন্দর্য ত্যাগ করা। বিধবার মৃত্যু অবধি সৌন্দর্য ত্যাগ করা। (গোয়র মাহরামের নিকট

সৌন্দর্য প্রকাশ হারাম) পুনঃবিবাহ করাকে মন্দ ও দোষগীয় জানা (অথচ মন্দের পথে পা বাঢ়াতে এবং ব্যভিচার করতে ভয় করে না !)

মৃতের নামে কুরআনখানি, ফাতেহাখানি ও চল্লিশে (চালসে) করা। মুর্দার দম যাওয়ার স্থানে কয়েকদিন ধরে লাতা দেওয়া, বাতি ও ধূপ জুলিয়ে রাখা। এই বিশ্বাস যে বাড়িতে রহ আসে। মৃত যা খেতে ভালোবাসতো তাই সদকা করা। মৃতের ব্যবহাত পোশাকাদি সদকাহ করা। কারো মরার পূর্বেই কবর খনন করে রাখা। দাফনের পর কয়েকদিন সকালে সকালে কবর যিয়ারত করা। যিয়ারতের জন্য কোন দিন নির্ধারিত করা, কারো কবর যিয়ারতে তাবারুক বা নেকীর আশা করা। কবরের সামনে মুসল্লীর মত খাড়া হওয়া। কোন যিয়ারতকারীর মাধ্যমে সালাম পাঠানো। নামায ও তেলাওয়াত দ্বারা ঈসালে সওয়াব করা। ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কোন অনুষ্ঠান করা। সালেহীনদের কবরের নিকট দুআ কবুল হয় এই বিশ্বাস রাখা এবং এই উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা। কবর স্থানের গাছ-পালাকে পবিত্র মানা এবং তা কাটতে নেই মনে করা। কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর থেকে সফর করা তাতে এত এত নেকী মনে করা।

কবর বাধাঁনো, শিয়ারদেশে পাথরের উপর নাম খোদাই করা, কোন আয়াত লিখা বা 'জান্নাতী' লিখা। কবরের উপর দর্গা, মায়ার ও বাগান তৈরী করা, মসজিদ ও গম্বুজ নির্মাণ করা, বাতি জুলানো, ধূপ-ধূনা দেওয়া, মাটির হাতি-ঘোড়া পেশ করা, নয়র নিয়ায় পেশ করা, পশু যবাই করা। কবরকে সিজদা করা, তার তওয়াফ করা, সম্মুখ করে কবরবাসীর ধ্যান করা, কবরের নিকট বসে বা স্পর্শ করে তাবারুক নেওয়া। কবর বা মায়ার চুম্বন বা স্পর্শ করে গায়ে মাখা। কবরের দেওয়ালে বা মায়ারে কপাল, গাল পিঠ বা পেট লাগিয়ে দুআ করা। সন্তান লাভের আশায় যৌনী দ্বারা স্পর্শ করা ! তাঁয়ীম করে কবরের দিকে পিঠ না করা। কবরের প্রতি সম্মুখ করে নামায পড়া। কবর বাসীকে নাজাতের অসীলা বা বিপদে সুপারিশকারী মানা, তার অসীলায় দুআ করা। তার নামে আল্লাহর উপর কসম খাওয়া। তার নিকট সাহায্য, সন্তান, সম্পদ, সুখ ও বিপদ মুক্তি চাওয়া। কবরের পাশে ধ্যান ও যিকর করা। কবর যিয়ারতের পর উল্টাপায়ে ও কবরকে সামনে করেই ফিরে আসা। মাসজিদে কারো কবর দেওয়া। কবরের উপর উরস, মেলা প্রভৃতি পাপের মিলনক্ষেত্র অনুষ্ঠান করা, চাদর চড়ানো।

মদীনাবাসীর মসজিদে নববী প্রবেশ কালে প্রত্যেকবার নববীর কবর যিয়ারত করা। তাঁর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা সফর করা। নামাযীর মত বিনয় সহকারে কবরের প্রতি মুখ করে খাড়া হয়ে দরজ ও দুআ পাঠ। তাঁর নিকট গোনাহ ইস্তেগফার চাওয়া। (আল্লাহ তাআলা বলেন,- যার অর্থ, যখন তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে তখন যদি তারা তোমার (নবীর) নিকট আসত ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা

প্রার্থনা করত এবং রসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত, তবে নিশ্চয় তারা আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু রূপে পেত। (সূরা নিসা ৬৪) এই ইস্তেগফার তাঁর পার্থিব জীবনে জীবিতাবস্থার কথা। তাঁর মৃত্যুর পর এরূপ আশা নিছক ভুল ও বিদআত। সুতরাং তাঁর কবর যিয়ারত করলেই কারো পাপ ক্ষয় হয় না।) তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়া, তাঁকে অসীলা মানা, তাঁর নাম নিয়ে আল্লাহর উপর কসম খাওয়া, তাঁর নিকট শাফাতাত চাওয়া। প্রয়োজন লিখে হজরার বা তাঁর ধারে-পাশে নিষ্কেপ করা। তাঁর বা অন্য কারো কবরের উপর আতর ছড়ানো। হাজীদের সাথে সালাম পাঠানো। চিরকুট ও আতর পাঠানো। তাহিয়াতুল মাসজিদ না পড়ে কবর যিয়ারত। লম্বা সময় ধরে হজরার প্রতি মুখ করে নিজের জন্য দুআ করা। কারো মৃত্যু দিবস পালন করা। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম যিয়ারত কারীর সব প্রয়োজন জানেন মনে করা। তাঁর কবরকে সামনে করে ইচ্ছাকৃত নামায পড়া বা যিকর করা।

মদীনার যিয়ারতে মাসজিদে নববী ও মাসজিদে কুবা ছাড়া অন্যান্য মাসজিদ সওয়াবের উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা, মাসজিদে নববীর মেহরাব, মিমুর, হজরার রেলিং ইত্যাদি স্পর্শ করে তাবার্ক। মদীনার যিয়ারতে মাসজিদে নববীতে চলিশ ওয়াক্ত নামায পড়তেই হয় মনে করা। সবুজ গম্বুজ থেকে গড়িয়ে পড়া পানি দ্বারা তাবার্ক। প্রথম কাতার ছেড়ে আসল মসজিদে নামায। প্রত্যহ বাকী যিয়ারত। মাসজিদ থেকে উল্টা পায়ে বের হওয়া। নবী সঃ এর সমাধিষ্কেত্রকে আল্লাহর আরশ অপেক্ষা অধিক মর্যাদাপূর্ণ মনে করা !

বিবাহে প্রচলিত কৃপথা ও বিদআত যেমন, কন্যাপক্ষের নিকট হতে বরপক্ষের সেলামী, ঘুস বা পণ গ্রহণ। কোট শিপ (ইউরোপীয় প্রথায় বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে হৃদয়ের আদান প্রদান)। বর, (মাহারেম অথবা কোন মহিলা) ছাড়া অন্য কারো বউ দেখা। বর কর্তৃক কনেকে পয়গামের অঙ্গুরী পরানো এবং ভবিষ্যতে তা তাদের দাম্পত্য-সুখের কারণ ভাবা ও খুলে ফেললে অঙ্গলের আশঙ্কা করা, কোন নির্দিষ্ট দিনে বা মাসে বিয়ে শুভ বা অশুভ মনে করা। লগন ধরানো। গায়ে হলুদ। (অবশ্য এই সময়ে দেহের রঙ উজ্জল করার উদ্দেশ্যে গায়ে হলুদ মাখলে ভিন্ন কথা।) হাতে সুতো রাখা। সাথে যাতি, কাজললতা বা কোন লোহা রাখা। শিবতেল ঢালা। ঢিকি মঙ্গলা, আলমতালায় লাতা ও সিন্দুর দেওয়া। আইবুড়ো বা থুবড়ো ভাত। (বিশেষ করে গম্য পুরুষের হাতে গম্য নারীর এবং গম্য নারীর হাতে গম্য পুরুষের ভাত ও ক্ষীর খাওয়া অবিধি।) বরযাত্রি বা কনে-যাত্রী দর-কষাকষি করে প্রয়োজনের অধিক গেয়ে অপরপক্ষের অসম্মতি সত্ত্বেও জবরদস্তি তার খেয়ে খরচ বৃদ্ধি করা। বর আগমন করে মহল্লার মাসজিদে গিয়ে বিশিষ্ট কোন নামায আদায় করা।

(অবশ্য বিয়ে মাসজিদে পড়ানো হলে মাসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই রাকআত তাহিয়াতুল মাসজিদ সকলকেই পড়তে হয়।) মাসজিদে (বেনামায়,

অপবিত্র ও ধূমপায়ী ইত্যাদি) বর বা কনেয়াত্রী রেখে মাসজিদের মান নষ্ট করা কোন ক্রমেই বৈধ নয়।) পীর তলায় (!) বরের সালাম করা। আলম তলায় (যেখানে বরকনেকে বসানো হয় সেখানে) ঝুকে মাটি বা বিছানা ছুঁয়ে সালাম করা। দর্শককে বা উপস্থিত মজলিসকে ঐ রূপ সালাম করা। (আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম করাই সুন্নত। নারী-পুরুষের অবাধ মিলামিশা ও গান-বাজনার কথা তো বলাই বাহ্য। যাতে মুসলিম রহচিল গৃহ কর্তার লজ্জা ও খোদাভীতি হওয়া উচিত।) পান -ভোজনে অপচয় করা। নাম মাত্র মোহর বাঁধা ও আদায় না করা বা করার নিয়ত না রাখা। বিয়ে পড়ানোর সময় এক থালায় দেন মোহরের জেওরাদির সাথে পান-সুপারি রাখা। বরকে কেবলা যুখে বসানো, কনের নিকট ইয়ন বা বিবাহের অনুমতি নেয়ার অনুষ্ঠান এবং ওলী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অন্য কারো ইয়ন তলব। এই অনুষ্ঠানে কনেকে উল্ট করে সায়া-ব্রাউজ পরানো। বর্তমান প্রচলিত উক্তিল-সাক্ষী বানানোর প্রথা। (অর্থ পাত্রীর মৌখিক অনুমতির উপর কোন সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। এর জন্য তার তরফ থেকে (অনুমতি পেয়ে) অভিভাবকের অনুমতিই যথেষ্ট। বরের সীকারোভির সময় কমপক্ষে দুই-জন পুরুষ সাক্ষী জরুরী।) আকদের শেষে সকলের হাত তুলে জামাআতি দুআ। বরকে অর্ধ গ্লাস শরবত ও অর্ধ পান খেতে দেওয়া এবং অবশিষ্ট উচ্চিষ্ট অর্ধশরবত ও পান কনেকে খেতে দেওয়া। জামাই দেখতে নানা মাতামাতি ও 'চিনি' খেলা। বর-কনে একত্রিত করে সকলের সামনে গাঁটছড়া বাঁধা প্রভৃতি বিভিন্ন কীর্তি। বিবাহের পর হানিমুন ও বিবাহ বার্ষিকি পালন। বধুর বিদায়কালে বড়দের পা ছুঁয়ে সালাম এবং মিষ্টান্ন বিতরণ। দুধ ইত্যাদি দিয়ে বাসর ঠাণ্ডা।

তালাকের বিদআত যেমন, স্তীর মাসিক অবস্থায় তালাক, যে পবিত্রতায় সহবাস করা হয়েছে সেই পবিত্রতায় তালাক। তালাকের উপর কসম খাওয়া। এক মজলিসে তিন তালাক।

শিশুর জন্ম সংক্রান্ত প্রচলিত বিদআত যেমন, গভিনীকে সাতভাত ও পাঁচভাজা খাওয়ানোর অনুষ্ঠান। জন নষ্ট হওয়ার ভয়ে বিভিন্ন তাবীয়-নোয়া বাঁধা। কোন শরয়ী বা বৈজ্ঞানিক হেতু বিনা অন্য কোন হেতু বা কারণে সন্তান অঙ্ক বা বিকলাঙ্গ হবে ভাবা। প্রসব হতে কষ্ট হলে জাপে কুরআনী (!) বা অন্য তাবীয় বাঁধা। প্রসব হওয়ার সময় প্রস্তুতিগৃহে ছেঁড়া জাল, মুড়ো ঝাটা, লোহা ইত্যাদি রাখা। দু কুড়ি দিন বা চলিশ দিনের পবিত্রতা অনুষ্ঠান (যদিও প্রস্তুতি পূর্বেই পবিত্রা হয়ে গেছে অথবা পরে হবে।) খতনার সময় (মুসলমানিতে) বিভিন্ন আড়ম্বুর ও ক্ষীর খাওয়ানোর ঘটা। লিঙ্গত্বকারী ভাবে কারো জন্ম হলে ফিরিশতা খাতনা করেছে ভাবা এবং পরে পান কাটা ও লিঙ্গের উপর খুর ফিরানো। শিশুর জন্ম বার্ষিকি বা হ্যাপি বার্থ ডে পালন করা।

প্রচলিত পাল-পার্বনের বিদআত যেমন- নবীদিবস, ফাতেহা ইয়াফদহম, দোয়াফদহম, আখেরী চাহার শোয়া, শবে মিরাজ, জুমআতুল বিদআহ, শবেবরাত, তার নামায ও দীপালীসহ বিভিন্ন ঘটা। মহররম ও তার তাজিয়া, নিশানা, মর্সিয়া, বাদ্য ও আত্মপুহার দ্বারা শোক পালন এবং অন্যান্য সমারোহ। এ সবের মধ্যে মাতম করা জাহেলিয়াতের কুপ্রথা। প্রকাশ থাকে যে, আশুরার দিনে হ্যরত হসাইন (রাঃ) শহীদ হয়েছেন বলে রোয়া রাখা হয় না। বরং ঐ দিনে এবং ওর আগে বা পরে আর একদিন রোয়া রাখা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নত ও নির্দেশ। হ্যরত হসাইন (রাঃ) এর জন্য ঐ দিনে অথবা আর কারো জন্য কোন দিনে শোকপালন ও মৃত্যুদিবস পালন করা বিদআত। আশুরার দিনকে শোকপালনের দিনরূপে গ্রহণ করে শিয়ারা এবং ঐ দিনকে সৈদ বা খুশীর দিন রূপে গ্রহণ করে নাসেবীরা (যারা হ্যরত আলী ও তাঁর বংশধরের প্রতি বিদেশ রাখে) সূরী বা আহলে সুন্নাহর নিকট ঐ দিন কেবল নবীর সুন্নাহর অনুকরণে রোয়া পালনের দিন। মহররমের চালসে করা। নবাম (!) এবং পৌষপার্বন (!)

ঈদের বিদআত যেমন, সমসূরে ঈদের তকবীর পাঠ। ঔবিধ জিনিষ দ্বারা সাজ সজ্জা এবং ঔবিধ খেল তামাশা দ্বারা খুশী করা। ঈদের নামায পড়ে কবর যিয়ারত।

ভোজের দাওয়াতে সৃতঃপুরোদিত ভাবে খরচে অতিরঞ্জন করা; দরিদ্র ছেড়ে কেবল ধনীদেরকে দাওয়া। নতুন গৃহ নির্মাণের পর উদ্বোধন করা বা জিন-ভূত বিতাড়ণের উদ্দেশ্যে মিলাদ পড়ানো। (অবশ্য নতুন ঘরের খুশীতে পান-ভোজন করানো দোষের নয়।) কোন প্রতিষ্ঠান উদ্বোধনে ফিতা কাটা প্রভৃতি অনুষ্ঠান।

খাবার সময় ডান গালে, বাম গালে এবং গিলে নেওয়ার পর পর নির্দিষ্ট যিকর বা দুআ, খেতে খেতে বিভিন্ন যিকর।

কোন মসীবত বা পরাজয়ের সময় কালো কাপড় পরিধান করে বা কালো নিশানা উড়িয়ে শোক পালন। বদনয়র দূর করতে তাবীয়, নোয়া, সুতো, ছেঁড়া জাল বা জুতো, মুড়ো ঝাঁটা, ভাঙ্গা ঝাঁড়ি প্রভৃতি ব্যবহার। এই উদ্দেশ্যে শিশুর পাশ কপালে বা গালে কালো ফেটা দেওয়া। গাছে ভাঙ্গা ঝাঁড়ি ও গাঢ়িতে ছেঁড়া জুতো বাঁধা। খেতে মানুষের আকারে কোন মৃত্তি গাড়া। (প্রকাশ যে মৃত্তি গাড়া হারাম। তা যদি খেতে পাখী বিতাড়নের উদ্দেশ্যে হয় এবং প্রকৃতপক্ষে তা ফলপ্রসূ ও জরুরী হয় তবে মন্তক না গড়া উচিত।)

কোন ব্যক্তি, ঐতিহাসিক স্থান কবর ইত্যাদি দ্বারা তাৰার্ক গ্রহণ।
পীর বা মায়ারের নামে পশু উৎসর্গ করা। গায়রস্লাহর নামে গরু, খাসি প্রভৃতি ছাড়া বা মানত করা। সংসার ত্যাগী বা বৈরাগী হওয়া। কাম দমনের উদ্দেশ্যে খাসি করা।

দেহপীড়নের সাথে কোন ইবাদত করা। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে) কোন হালাল বস্তুকে হারাম করা। শরীয়তকে স্তানের নিভিতে ওজন করা। দীনে বিভিন্ন দল সৃষ্টি করা। তাসাউবুফ বা রাজনীতি দ্বারা ইসলামী দাওয়াত শুরু করা। (যেহেতু সকল আম্বিয়া আলাইহিমুসালাতুঅস্সালামগণের সুন্নত তওহীদ দ্বারা দীনের দাওয়াত ও তবলীগ শুরু করা। আর তওহীদ ইসলামী দাওয়াতের মূল বুনিয়াদ।) অভিনয়, উপন্যাস-উপাখ্যান, গজল-গীতি, বয়াত ইত্যাদিকে দাওয়াতের অসীলা মান। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অর্থ ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন শাসক, প্রভু বা আইনকর্তা নেই’ করা।

ধর্মীয় প্রশ্নে বিদআত যেমন, আল্লাহ আরশে কিভাবে আসীন আছেন ? আল্লাহর অবয়ব আছে কি না ? তাঁর হাত-পা কেমন ? আকাশে নেমে এলে আরশ খালি হয় কিনা ? ইত্যাদি।

অমূলক বিশ্বাস ও কুধারণার বিদআত যেমন, কোন বিশিষ্ট (যা শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত নয় এমন) মাস, দিন, ক্ষণ বা স্থানে অথবা শুভাশুভ আশা ও ধারণা রাখা। যেমন, অমাবশ্যায় অমুক হয়, রবিবারে বাঁশ কাটতে নেই জুর হয়। বৃহস্পতিবার অমুক করতে হয় বা তার বিকাল ও সন্ধা অশুভ। অমুক মাসে বিয়ে নেই। মলমাসে কোন শুভ কাজ নেই। অমুক দিনে যাত্রা নেই। ইত্যাদি মনে করা।

অমুকের মুখ, খালি কলসী বা অন্য কিছু দেখে, কারো নাম, কাক, কুকুর বা অন্য প্রাণীর ডাক শুনে অমঙ্গলের আশঙ্কা করা। অমুক জিনিস রাত্রে বা সকালে বের করতে বা দিতে বা বেচতে নেই। রাতে ঝাঁড়ু দিতে নেই। ইত্যাদি ভাবা।

কোন রাশিচক্রকে মঙ্গলমঙ্গল বা বৃষ্টি-অনাবৃষ্টির কারণ ভাবা।

আরো হাস্যকর অসার (মেয়েলি) বিশ্বাস যেমন, কাস্তে দ্বারা মাটিতে আঁক দিলে দেনা হয়। শিশুর কান মললে তার হায়াত করে যায়। শরকাঠি বা বাম হাত দ্বারা আঘাত করলে (আঘাত প্রাপ্ত শিশু) কৃশ হয়ে (শুকিয়ে) যায়। কোমরে পা ঠেকলে ব্যথা হয়। বালিশে পা পড়লে ঘাড়ে ব্যথা হয়। শাক ডিঙালে জিভে ব্যথা হয়। ঘরে ভাঙ্গা আয়না রাখলে গরীব হতে হয়।

নাপাক অবস্থায় গাছে হাত দিলে গাছ মারা যায়, মুখে মিষ্টি নিয়ে কোন ফলগাছ লাগালে তার ফল তিক্ত হয় না। খেল (কাদা মাখামাখি) খেললে, আথের বোঝার উপর বসলে বা ব্যাঙের বিয়ে দিলে বৃষ্টি হয়। বাম চোখ লাফালে নোকসান ও ডান চোখ লাফালে লাভ হয়। বামের শিয়াল ডাইনে গেলে অথবা তার বিপরীত গেলে লাভ অথবা নোকসান হয়। হয় আঙুল বিশিষ্ট সন্তান ভাগ্যবান হয়। এক চোখ দেখলে ঝগড়া হয়। হাত থেকে কিছু পড়ে গেলে বা গৃহের ছাদে বা চালে কাকে আদার খাওয়ালে মেহমান আসে। গলায় খাদ্য বা পানীয় লাগলে কোন আতীয় স্মরণ করে। প্রথম ডিমে নোড়া বুলালে মুরগী নোড়ার মত বড় বড় ডিম দেয়। চালুন বুলালে

তার ছিদ্র সমান অসংখ্য ডিম পাড়ে। শিশুর ভাঙা দাঁত পানিতে ফেললে অথবা ইদুরের গর্তে দিলে তাদের মত সরু সরু দাঁত হয়। অমুক জায়গায় গোসল দিলে শিশু রোগমুক্ত হয়। হাতির পিঠে শিশুকে ঢাললে মোটা হয়। ভালুকের লোম ব্যবহার করলে জুর যায়। যাত্রা পথে বাড়ি থেকে বের হতে কেউ পিছু ডাকলে যাত্রা শুভ হয় না বা কাজ সিন্ধ হয় না। ইত্যাদি অযৌক্তিক বিশ্বাস।

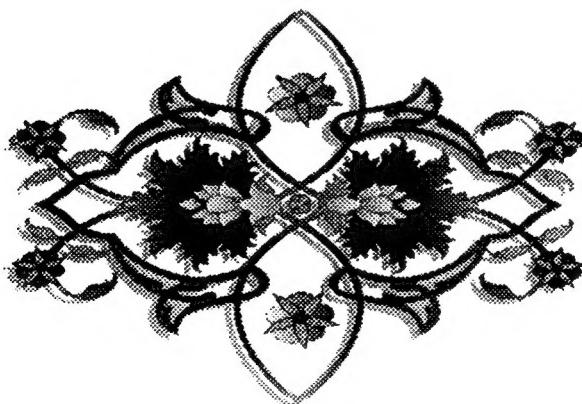
তাবীয়-গঙ্গা, লোহা ও তামার তার, শষ্ঠি ও জীব শাঁখ প্রভৃতি আরোগ্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহার। কোন পাথীর হাড়, পালক, কোন পশুর চুল প্রভৃতির তাবীয় বাঁধা। ইত্যাদি বিশ্বাসগত অমূলক বিদআত যা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে এবং যার বেশীর ভাগ ‘বুড়ি’ দের নিকট হতে ‘হিফয়’ করা এবং বেওয়ায়ত করা হয়ে থাকে।

মৃত ব্যক্তির পা তলে দাঁড়াতে নেই, দাফন কাজে ব্যবহৃত অতিরিক্ত বাঁশ ও দাফনে ব্যবহৃত অতিরিক্ত কাপড় ব্যবহার করতে নেই, জানাজা পড়ার সময় লাশের বাঁধন খুলে দিতে হয়, লোয়ানো পানি ডিঙ্গাতে নেই মনে করা। দম যাওয়ার স্থানে লাতা ও ধূপবাতি দেওয়া, দেনমোহরের গয়না ও কাপড়াদি কাঁসের থালায় আনা, বিয়ে পড়ানোর সময় বরকে কেবল মুখে বসানো, বিজোড় টাকার দেনমোহর বাঁধা, দেনমোহরের কিছু টাকা বাকি রাখতে হয়, (আর পণের টাকা কড়ায় কড়ায় আদায় করে দিতে হয়) মনে করা, ছেলে বিয়ে করতে যাবার সময় গাড়িতে চড়লে পর্দা করে ছেলের পায়ে মায়ের তেল দিয়ে জিঞ্জাসা করা; বাবা ! কোথায় চললে ? ছেলে বলে, ‘মা ! তোমার জন্য দাসী আনতে চললাম।’ (এটি খুবই ধূৰ সত্য কথা। ঘরে ঘরে বধু নির্যাতনই এর সাক্ষি।) এ বিদায়ের সময় মুখে দুধ ভাত দেওয়া, বধু বরণের সময় তেল ফুল বা মিষ্টি ব্যবহার, নববধূকে প্রথম দিনেই শুশুর বাড়ীতে থেতে নেই মনে করা, বাসর ঘরে একই প্লেটে সৃষ্মী-স্ত্রী ভাত থেতে স্ত্রীর প্লেট ধরে থাকা, বিয়ের কথা (সমৃক্ষ) চলাকালীন কনে ডিম ভাঙলে বিয়ে ভেংচে যাবে ভাবা।

নতুন গরু বা মহিষ ক্রয় করলে তার পা ধূমে তেল দেওয়া (!) গরুর পায়ে ঝাঁটা ঠেকাতে নেই মনে করা, গরু মারা গেলে তার মুখে দূর্বাধাস রাখা, গাভিন গায়ের গলায় আমড়ার আঁটি চাবি কাঠি, কড়ি, চামড়া ইত্যাদি বাঁধা, সদ্যজাত বাচ্চুরের গলায় লাতাকানি বাঁধা, গরু পরবের (?) দিন গরু-ছাগলের গায়ে রঙিন ছাপ দেওয়া। নবজাত শিশুকে চাপ্পিশ দিন অতিবাহিত না হওয়ার প্রবে ঘর হতে বের করতে নেই মনে করা, নয়র লাগার ভয়ে শিশুর কপালের পাশে বা গালে কালির ফেঁটা দেয়া বা আঙ্গুল কামড়ানো, কুলোতে বসে বাক্সা ছিক্কলে অসুখ ছাড়ে না ভাবা। কন্যা শিশুর জন্মক্ষনে তার কানে (আজান নয়) বাটি বাজানো, কাপড় নিচোড়া পানি পায়ে নিলে অসুখ ছাড়েনা, ভালপাতার পাথা ঘুরানোর সময় কারো গায়ে লাগলে অসুখ হয়, (তার জন্য মাটিতে ঠেকাতে হয়) কশে ঘা (শালকী) হলে শালিক পাথির

পায়ের ধূলোয় ভাল হয়, দুই ইঁট গেড়ে ভাত খেলে মা বাপের মাথা খাওয়া হয়, আমানিতে হাত ধুলে মরার সময় মা-বাপের মুখ দেখতে পায়না, কোন কথা চলাকালীন কেউ ইঁচলে কথার সত্যায়ন, দুই মুরগী মুখেমুখী হলে, হাত হতে কিছু পড়লে বাড়িতে কুটুম আসে, জোড়া কথা একই কথা দুজনের মুখ হতে এক সঙ্গে বের হলে কুটুম আসে, পায়ে মইদি মাখতে নেই (কারণ নবী সাহেব দাঁড়িতে লাগিয়ে ছিলেন তাই !) শাহাদৎ আঙ্গুলে চুন লাগাতে নেই, রাতে নখ কাটতে নেই, চুল আঁচড়াতে নেই, সঙ্গা বেলায় ভাত খেতে নেই, কারণ মওতারা খায় (?!) ভাদ্র মাসে ঝাঁটা কিনতে নেই, গোয়ালে মাটি দিতে নেই, অগ্রহায়ন মাসে কুকুর বিড়ালকে ছি করতে নেই, ঝুড়ি ঝাঁটা বাইরে রাখতে নেই ধানের ধূলো ঝাড়তে নেই (আহা ধানের ধূলো পায় কে?) বিয়ে বিদায় না হওয়া পর্যন্ত ঝাড়ু দিতে নেই, খাবার জিনিস ঝাঁটা করে ঝাড়তে নেই, (যেহেতু মা লক্ষ্মীকে ঝাঁটা মারা হয় তাই !) পরীক্ষা দিতে খাবার আগে ডিম খেতে নেই, (খেয়ে পরীক্ষা দিলে ডিমের ঘতই নম্বর অর্থাৎ জিরো পাবে।) রাতের বেলায় চাল চিবিয়ে খেতে নেই, রাতে আঙ্গুল ফোটাতে নেই ইত্যাদি মেয়েলী ধারণা।

পিঁয়াজ রসনের ছাল না গোঢ়ানো, ধানের রাস ও পাটার উপর খড়ের আঁটি রাখা, গোলার নীচে ঘুঁটে রাখা, মাপার শেষে কিছু চাল ফিরিয়ে নিয়ে বর্কতের আশা, মাপার শুরুতে বিসমিল্লাহ বা এক বলার পরিবর্তে বর্কত বলা, গোস্তে গোস্ত মেরে বর্কতের আশা, ধান চাল পাছুরতে কুলো খালি না করা, ঘরের মুদ্দনী তুলতে সিঞ্চুর ব্যবহার, ছেলে ঘুমালে কোদাল কাউকে দিলে পানি দিয়ে দেওয়া, ছেলে কোলে থাকলে কোদাল কুড়ুল হাতে বহন না করা ইত্যাদি বিদআত।



পরিশেষে

বিদআত কি তাবে রুখব ?

- ১- যথা সম্ভব অধিকাধিক সুন্নাহ জানা ও প্রচার করার মাধ্যমে বিদআতের মুকাবিলা করতে পারা যায়।
- ২- বিদআত রুখার জন্য সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের এবং বিশেষ করে শিক্ষিতদের নিদিষ্ট কর্তব্য রয়েছে। তমধ্যে ওলামাদের কর্তব্য ও ভূমিকা সবচেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সকল রকম বাধা ও সৃষ্টিকে বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে সহীহ সুন্নাহকে বাস্তবায়ন করে, তার প্রত্যেকটি নির্দেশের উপর আমল করে নিজেদের জীবন ও সমাজ গড়ে তুলে আমরা বিদআতকে প্রতিহত করতে পারি।
- ৩- বিদআত সৃষ্টির যে সমস্ত মূল কারণ রয়েছে তা ধ্বংস ও নির্মূল করে বিদআতের প্রাদুর্ভাব থেকে আমরা বাঁচতে পারি।
- ৪- যে আলেম ইজতেহাদের উপযুক্ত নয় তাঁর নিকট হতে কোন ইজতেহাদী মত গ্রহণ করব না এবং অক্ষভাবে তাঁর ব্যক্তিত্বের খাতিরে তাঁর ইর্জিত্বাদ মতে আমল করব না।
- ৫- উদার ও খোলা মনে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অন্ত দ্বারা প্রচলিত প্রথা ও কুসংস্কারের শরয়ী অপারেশন করব এবং এ ব্যপারে মজবুত অন্ত কেবল কুরআন, সহীহ বা হাসান হাদীস এবং সহীহ তাবে প্রমাণিত সাহাবাদের আদর্শকেই মানব। আর ফায়ায়েলে যয়ীফ ব্যবহার চলবে এই তর্ক করে যয়ীফ, যয়ীফ জিদ্দা ও মওয়ু হাদীসের উপর আমল করব না।
- ৬- আমরা কোন মতবাদীর ব্যক্তি পূজা করে অথবা কোন দলীয় নীতির ভক্তি পূজা করে তার কোন রায়, ইজতিহাদ ও মতবাদের অক্ষ পক্ষ পাতিতু করব না। আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে 'হক', ন্যায় ও প্রকৃত সত্যের নাগাল। যার অসীলা হবে শুল্ক প্রতিপাদিত ও যুক্তি যুক্ত দলীল।
- ৭- কাজ যত ছোটই হোক, তাতে আমরা সুন্নাহর সীমা লংঘন করব না।
- ৮- সাধারণ 'শুন মৌলভী', নিম আলেম ও ওস্তাদীদেরকে ফতোয়া দেওয়া হতে রুখব এবং আমরা তাদেরকে কোন ফতোয়া জিঞ্চাসাও করব না যারা ফতোয়া দেওয়ার উপযুক্ত নয়, তাদের ফতোয়া মানবও না-যদি জানি যে, প্রকৃত মুফতীগনের ফতোয়া এর পরিপন্থী।

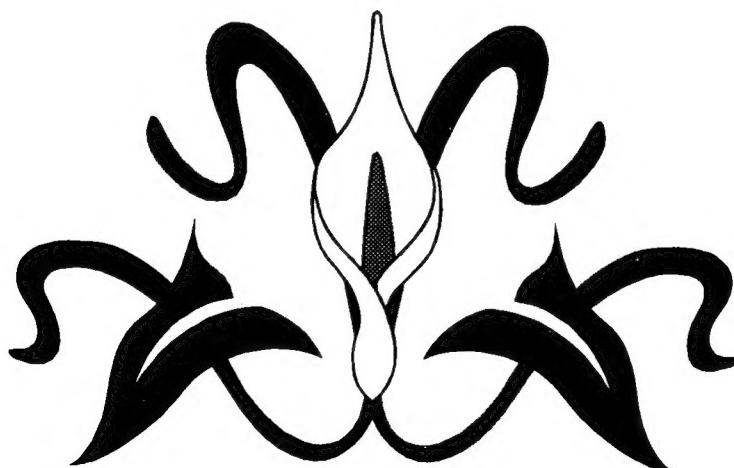
৯- আমরা কোন বিশ্বাস বা কর্মগত বিষয়ে কোন বিধিমীর অনুকরণ করব না।
মুসলিমদের প্রতি অমুসলিমদের বিশ্বাস ও প্রথার অনুপ্রবেশ পথ সম্পর্গভাবে বক্ষ
করব।

১০- দ্বিনী বিষয়ে আমরা জ্ঞানকে প্রাধান্য দেব না, বরং জ্ঞান ও সকল কিছু সৃষ্টি কর্তা সর্বজ্ঞ আল্লাহর হিকমত ও যুক্তিকে প্রাধান্য দেব। যদিও আমাদের নিকট তা বোধগম্য নয়। (বিস্তারিত দৃষ্টব্য, আল বিদআহ, তাহদীনদুহা অমাওকিফুল ইসলামি মিনহা, ৪৯৩ - ৪৯৮ পঃ)

এ সব কিছু যদি আমরা করতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ দেখব যে, বিদআত ও বিদআতী এধরা থেকে চিরতরের জন্য বিদায় নিয়েছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাই করার তওফিক ও প্রেরণা দিন। আমীন।

অসমান্বিত আলা নবিয়েন মুহাম্মদ, অ আলা আ-লিহী অ আসহাবিহী
আজমাস্টিন।

00000000000000000000000000000000



البدعة تعريف وتحذير

تأليف

عبد الحميد الفيضي

بنغالي

ردمك ٩١٩١-٦-٩٩٩٠

المكتبة الشاعرية للدعوة والآدبيات
الإسلامية والأوقاف والدعوه والإرشاد